দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্ ও তরিকত নিয়ে সাধারণ বিতর্ক

সৈয়দ ফখরুল ইসলাম আল কাদরী শামীম শাহ্

গাউস উল আজম, গাউসাস সাকলাইন, শামসুল কাওনাইন, রওশন জামীর যুগশ্রেষ্ঠ অলি দয়াল বাবা
আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ শায়খ খাজা শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ)

দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্ ও তরিকত নিয়ে সাধারণ বিতর্ক

সৈয়দ ফখরুল ইসলাম আল কাদ্‌রী শামীম শাহ্

কাদরিয়া ভাণ্ডার সিরাজ শাহ্‌র আস্তানা

সূচিপত্র

০৫ শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ)

১৭ অলি কাকে বলে? অলির কাছে যাওয়া যায় কিনা? অলির হাতে নজরানা বা উপঢৌকন দেওয়া যায় কি না?

২০ মোর্শেদ বা পীরের হাতে বাইয়াত হওয়া যায় কি না? মোর্শেদ বা পীর কোরআনে আছে কি না?

২৯ নবী বা আউলিয়া কেরামের ইন্তেকালের আগে বা পরে তাঁর ওয়াসিল ধরা শরীয়ত মতে জায়েজ কিনা এবং মোরর্শেদ (পীরের) দরবারে বা অলির দরবারে যাওয়া যায় কি না?

৩৫ মাজার কাকে বলে? মাজারে যাওয়া যায় কি না? যাওয়া বৈধ কি না? অলির ওয়াসিলা দিয়ে মাজারে কিছু চাওয়া যায় কি না? মহিলারা মাজারে যেতে পারে কি না? অলির মাজারে চুমু দেয়া যায় কি না?

৩৯ ওরশ কাকে বলে? ওরশ করা জায়েজ কি না? ওরশে গরু-ছাগল জবেহ্ করা জায়েজ কি না এবং ঐ মাংস দিয়ে যে নেওয়াজ তৈরি করা হয় তা খাওয়া জায়েজ কি না?

৪২ জিকির কাকে বলে? উচ্চস্বরে জিকির পড়া যায় কি না? দুরুদ শরীফ পাঠ করা জায়েজ কি না?

৪৫ কাদেরিয়া ভাণ্ডারের নিয়মিত অনুষ্ঠানমালা

৪৬ কর্তব্য ও নির্দেশনা

ভূমিকা

আমার জন্মদাতা পিতা ও আমার মুরশিদ কেবলা মাহাবুবে খোদা আশেকে রসূল, সুলতানুল আউলিয়া, সুলতানে আরেফিন, গাউছুল আজম, আলহাজ্ব সৈয়দ খাজা শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ)। দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্‌র জীবন অত্যন্ত বর্ণাঢ্য, বিচিত্র ও রহস্যে ঘেরা। তাঁর অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলী বা কেরামতের প্রমাণ রয়েছে যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে সংযোজনের সুযোগ নাই এবং এখানে সে প্রয়াস করা হয় নাই। এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে তাঁর জীবনের সাধারণ চিত্র কিছুটা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

তরিকত ও তাসাউফের আচার ও নিয়মাবলী নিয়ে যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে বিতর্ক। যেমন- মোর্শেদ বা পীরের হাতে বাইয়াত হওয়া যায় কিনা? কোরআনে এর নির্দেশনা আছে কিনা? অলি বা পীরের দরবারে বা মাজারে যাওয়া জায়েজ কিনা? ওরশ করা জায়েজ কিনা? উচ্চস্বরে জিকির বা দরূদ পাঠ জায়েজ কিনা ইত্যাদি। এই বিষয়ে কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকার পরও এ বিতর্কের অবসান নাই। তারপরেও কোরআন ও হাসিদের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের পথ চলতে হবে। এর ব্যতয় হলে চলবে না। এখানে মৌলিক সে বিতর্ক ও প্রশ্ন সম্পর্কে কোরআন ও হাদিসের আলোকে দালিলিক কিছু উত্তর সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কারণ এ সম্পর্কে কোরআন ও হাদিসে দীর্ঘ এবং বহু প্রমাণ রয়েছে। এখানে শুধু সংক্ষিপ্তভাবে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ পুস্তক পাঠে যদি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন, তাঁর প্রিয় হাবীব ও দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্ সম্পর্কে কৌতূহল ও তাঁদের প্রতি অন্তরে প্রেমের সৃষ্টি হয় এবং তরিকত ও তাসাউফের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় তবেই এ প্রয়াস সফল হয়েছে বলে মনে করবো। আল্লাহ্ সকলের মঙ্গল করুন। আমিন।

সৈয়দ ফখরুল ইসলাম আল কাদ্‌রী শামীম শাহ্

হযরত খাজা শাহ্ মোহাম্মদ
সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ)

শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ)

আমার জন্মদাতা পিতা ও আমার মুরশিদ কেবলা মাহাবুবে খোদা আশেকে রসূল, সুলতানুল আউলিয়া, সুলতানে আরেফিন, গাউছুল আজম, আলহাজ্ব সৈয়দ খাজা শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ)। নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দরের কুশিয়ারা গ্রামে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, ১০ আশ্বিন ১৩৩৯ এই মহান অলি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অলিয়ে কামেল আব্দুর রাজ্জাক শাহ্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ) এবং মাতা ছবুরুন নেছা। বাবা সিরাজ শাহ্'র প্রপিতামহ সৈয়দ ফজর আলীর পূর্বপুরুষগণ ইয়েমেন থেকে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের কুশিয়ারা গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সৈয়দ ফজর আলী ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র অধীনস্ত সোনারগাঁ পরগনার জমিদার মৌলবী আবুল খায়েরের নায়েব ছিলেন। কুশিয়ারা গ্রামের এই নায়েবের বাড়িটি সর্বসাধারণের কাছে 'সাহেব বাড়ি' হিসেবে পরিচিত ছিল। সৈয়দ ফজর আলী সৈয়দা জায়েদা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সৈয়দ ফজর আলী ও সৈয়দা জায়েদা খাতুনের দুই পুত্র সন্তান– সৈয়দ আবদুল আজীজ ও সৈয়দ আবদুল হামিদ। সৈয়দ আবদুল হামিদ চিশ্‌তীয়া তরিকায় আধ্যাত্ম সাধনায় প্রসিদ্ধি লাভের পর সৈয়দ আবদুল হামিদ চিশ্‌তী নামে পরিচিত হন। সৈয়দ আবদুল হামিদ চিশ্‌তীর তিন পুত্র সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তানই হচ্ছেন আমার পিতামহ ও দাদাপীর এবং দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্'র পিতা সৈয়দ হযরত দাতা আবদুর রাজ্জাক শাহ্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ)। বাবা সিরাজ শাহ্'র মাতৃকুল ভারতের কাশ্মির থেকে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয় এসে বসতি স্থাপন করেন। সৈয়দ নাসিরুদ্দিন কাশ্মিরী এ দেশে তাঁর মাতৃকুলের বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্ একজন বড় মাপের মশহুর অলি। মাতৃগর্ভ থেকে অলি হয়েই তিনি এই দুনিয়ায় আগমন করেছেন। অগণিত পাপী-তাপী, দুঃখী এবং

পথহারা মানুষের পথের দিশারী ও ত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। বাবা সিরাজ শাহ্ শৈশবেই ৪/৫ বছর বয়সে মাতৃহারা হন এবং পিতার অপত্যস্নেহে লালিত পালিত হতে থাকেন। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত হয়ে বলা চলে তিনি একাকী, নিঃসঙ্গতায় বেড়ে ওঠেন। শূন্যতা ও নিঃসঙ্গতা তাঁর অন্তরে ভাবের এক বিশাল প্রণোদোনা তৈরি করে। শৈশব থেকেই তিনি সে ভাবের সরোবরে নিমজ্জিত থাকতেন। পিতার সহায়তা তাঁর ভাবের সে সরোবরে যেন ফল্গুধারা তৈরি করে তাঁকে খোদাপ্রেমে উজ্জীবিত করে তোলে। ক্রমান্বয়ে তিনি স্রষ্টার প্রেমসাগরে ভাসতে শুরু করেন। পাশাপাশি তাঁর স্কুল-মক্তবের পড়াশোনা চলতে থাকে সমান্তরালভাবে।

পাঁচ বৎসর বয়সে নবীগঞ্জ কদমরসূল দরগাহ সংলগ্ন প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন তিনি। স্কুলে যাবার পথে দরগাহর কাছে অসংখ্য পাগল বসে থাকতেন। পাগলরা শিশু সিরাজ শাহ্কে কেবলি বলতেন, তোর পড়াশোনা লাগবে না, চলে যা। পাগলরা তাঁর বইখাতা ছিনিয়ে নিয়ে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন, কেউ কেউ জোর করে মুখে থু-থু খাইয়ে দিতেন। পাগলদের এই উৎপাতে তিনি ঐ স্কুল ছেড়ে বাড়ির কাছে কাজীবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে ভর্তি হন। কিন্তু সে পথেও ছিল অনেক পাগল। হাবীব পাগল, আনারস পাগল, শামুক পাগল বিভিন্ন নামের পাগল। আনারস খেতে পছন্দ করতেন বলে লোকে তাঁকে ডাকতেন আনারস পাগল বলে, এক পাগল সমস্ত শরীর শামুক দিয়ে জড়িয়ে রাখতেন বলে লোকে তাঁকে শামুক পাগল বলে ডাকতেন। এই পাগলরাও শিশু সিরাজ শাহ্কে নানাভাবে উত্যক্ত করতেন। কোন কোন পাগল তাঁকে ধরে পানিতে ফেলে দিতেন। কিন্তু এলাকার মানুষ সে সময় পাগলদের খুব সম্মান করতেন।

স্কুল শিক্ষার পাশাপাশি বাবা সিরাজ শাহ্ পিতা আব্দুর রাজ্জাক শাহ্র নিকট শরিয়ত ও তাসাউফের শিক্ষায় নিমগ্ন থাকতেন। পিতা তাঁকে 'লাইলাহা ইল্লাল লাহ' চিল্লা করাতেন, নামাজ-রোজা ও জিকির আজগার শিক্ষা দিতেন।

দয়াল সিরাজ শাহ্ স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে নারায়ণগঞ্জ বন্দর বি.এম. হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় বি.এম. হাই স্কুলের ঋষিকেশ নামে তাঁর এক শিক্ষক বালক সিরাজ শাহ্কে পায়ে ধরে সালাম করতেন। এই শিক্ষক তাঁকে বলতেন, 'তুমি অনেক বড় মানুষ হবে। আমার জন্য তুমি দোয়া করবে।' ঐ শিক্ষক ভোরে ঘুম থেকে ওঠে প্রতিদিন নিয়মিত ধ্যান করতেন। ১০ বছর বয়সে বাবা সিরাজ শাহ্ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মুন্সি নামক শিক্ষকের কাছে যখন আরবী শিক্ষা গ্রহণ করতেন তখন ঐ মাওলানা সাহেবও শিশু সিরাজ শাহ্কে পা ছুঁয়ে সালাম করতেন। সিরাজ শাহ্ বিব্রত হয়ে প্রশ্ন করলে মাওলানা সাহেব বলতেন, 'বাবা তুমি কে আমি তা জানি'। কিন্তু বি.এম. হাই স্কুলে যেতেও পথে নানান বিড়ম্বনা। পরে পরীক্ষা না দিয়েই সে স্কুল ছেড়ে

নারায়ণগঞ্জের আমলাপাড়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। আমলাপাড়ার 'সির্কোর গার্লস স্কুল'টি তখন নতুন করে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এই মাদ্রাসায় তিনি অনেকদিন শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটে, যখন একবার মাদ্রাসার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা তোলার জন্য প্রিন্সিপাল সাহেব মাদ্রাসার সকল ছাত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। চাঁদা তোলা সিরাজ শাহ্‌র পছন্দ ছিল না। তাই দয়াল সিরাজ শাহ্ মাদ্রাসার পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে চলে আসেন।

তখন প্রায় প্রতি রাতেই ঘুমাতে গেলে গভীর রাতে পাগলরা বাড়িতে এসে টিনের ঘরের দরজা ধাক্কাতেন আর বলতেন তুই আমাদের সাথে চল। পাগলদের ভয়ে অনেক সময় বাবা সিরাজ শাহ্ ঘরের ভিতরে চৌকির নিচে ঘুমাতেন। ১৩/১৪ বৎসর বয়স থেকে রাজ্জাক শাহ্ দয়াল সিরাজ শাহ্‌কে মাটির নিচে একা ৪১ দিন করে চিল্লা করানো শুরু করেন। তখন তিনি তিন বেলা তিলের তেলের ১টি করে রুটি খেয়ে স্বল্পাহারে এবাদত করতেন। সারাক্ষণ মোশাহেদা-ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন আর সবসময় 'লাইলাহা ইল্লাল লাহ্' জিকির করতেন।

আল্লাহ্ অলি যাঁরা তাঁরা সৃষ্টির সকল প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারেন। তাঁদের কাছে ভাষাগত কোন পার্থক্য থাকে না। যখন বাবা সিরাজ শাহ্‌র ১৩/১৪ বছর বয়স তখন তিনি ৭/৮টি ছাগল পালন করতেন। সেই সময়ে তিনি সে ছাগলদের কথা বুঝতে পারতেন, তাদের সাথে কথা বলতেন। সেই সময় তিনি বিভিন্ন পশু-পাখিদের সাথেও কথা বলতেন। মাঠে ছাগলদের রেখে ঘুড়ি ওড়াতেন কিন্তু কোন দিন কোন ছাগল জমিতে ঢুকে ধান বা শাক-সব্জি নষ্ট করতো না। ছাগলগুলো দয়াল সিরাজ শাহ্‌কে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতো, বলতো, 'বাবা তুমি খেলা কর আমরা কোন ফসলের ক্ষতি করবো না।' এটা দয়াল বাবার মুখের কথা।

রাতে যখন মাটির নিচে কবরের ভিতর চিল্লাকোঠায় বসে চিল্লা করতেন, তখন তাঁর নানী আইমুন নেছা চিল্লাকোঠার দরজায় বসে দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্‌কে পাহারা দিতেন। আর জোরে জোরে চিৎকার করে কিছু বলতেন। যাতে করে দয়াল সিরাজ শাহ্ মাটির নিচে একা ভয় না পান। এইভাবে নানী ও পিতা রাজ্জাক শাহ্‌র যত্ন ও সাহচর্যে বাবা সিরাজ শাহ্ নিরন্তর সাধনা ও আরাধনায় জ্যোতির্ময় এক মহানপুরুষ রূপে আবির্ভূত হন। তাঁর দেহ থেকে যেন জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। নূরের সাগরে স্নান করে তিনি যেনে নূরের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। আমাদের দিব্যচক্ষু নেই বলে আমরা অলি আল্লাহ্‌র সেই সৌন্দর্যরূপ দেখতে পাই না, তীক্ষ্ম কান নেই বলে তার অন্তর নিঃসৃত গূঢ় তত্ত্বকথা শুনতে পাই না। তাসাউফের ঝর্ণা তলায় বসে তিনি শুনেছেন কল্‌বের কলতান। লাভ করেছেন আল্লাহ্ ও রাসূলপাকের শান ও জ্ঞান।

মনসুর হাল্লাজ (রঃ) বলেছেন, 'সুফি লোকের সত্তা পৃথিবীতে একক পদার্থ– সেও

কাউকে চিনে না, তাঁকেও কেউ চেনে না। সুফি সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায় চলেন, অথচ মানুষ আল্লাহ্তায়ালার দিকে ইচ্ছা করে থাকে। অর্থাৎ সুফি লোক নিজের সত্তাকে মধ্যস্থল থেকে বিলুপ্ত করে দেয়। সমস্ত সৃষ্ট জগতকে ফানার স্তরে দেখতে পাওয়াই তাসাওউফ।' বাবা সিরাজ শাহ্র নিজের ইচ্ছা বলে কিছুই ছিল না। তিনি সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল করে থাকতেন। তিনি ছিলেন একজন প্রচারবিমুখ অলি ও সাধক। আধ্যাত্মিকতায় তিনি ছিলেন প্রবাদতুল্য, নৈতিকতায় উত্তম চরিত্রের অধিকারী, আদর্শে অনুকরণীয়, ব্যবহারে কোমল, মৃদুভাষী, নিভৃতচারী এক দরবেশ; যাঁর অন্তরে ফল্গুধারার মতো অহর্নিশি বয়ে চলছে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রেম।

মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী (রঃ) বলেছেন, 'একজন ঐ ব্যক্তি, যাঁর মুখ বন্ধুর প্রতি নিবদ্ধ, আর একজন ঐ ব্যক্তি যে, বন্ধুর মুখই তার মুখ।' প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির অবস্থান ভিন্ন। প্রথমটিতে আল্লাহ্র প্রতি গভীর নিমগ্নতা আর দ্বিতীয়টি আল্লাহ্র সত্তায় নিজের সত্তাকে ফানা বা বিলীন করে দেয়া। আল্লাহ্র অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে ফানার স্তরে উন্নীত হলে সেখানে এক ভিন্ন দ্বৈতের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। দয়াল সিরাজ শাহ্ সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রায় সময়ই আল্লাহ্র প্রেমে বুঁদ হয়ে হালে চলে যেতেন। তখন তাঁর নিজের বলে কোনও অস্তিত্ব থাকতো না, নিজস্ব কোনও রঙ থাকতো না। তিনি মহান রব্বুল আলামিনের রঙে রঙ্গিন হয়ে উঠতেন। এ যেন সাগরের মহাসাগরে গিয়ে মেশা। তিনি এমনই এক বিশিষ্ট শায়খ ও অলি আল্লাহ্ ছিলেন যে, তাঁর অসাধারণ তাওয়াজ্জো এত্তেহাদীর শক্তিতে ঘোর পাপী, মানুষের কঠিন হৃদয়ও মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হত, মৃতঅন্তর জিন্দা হয়ে সেখানে আল্লাহ্ পাকের জিকির হত এবং সেই মানুষ মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যেতেন। ইসলামের শরিয়ত, মারেফাত, হকিকত এবং তরিকতের এক মহান নিশান বরদার শিক্ষক ও অধ্যাপক তিনি। আর যে ব্যক্তি শরিয়ত, মারেফাত, হকিকত ও তরিকত– এ ৪টি বিষয়ে পারদর্শীতা লাভ করেছেন, সেই ব্যক্তি খাঁটি নায়েবে রাসূল। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন ও নিয়মিত তাহাজ্জুত নামাজ আদায় করেছেন। শরিয়তকে তিনি কঠোরভাবে আঁকড়ে রাখতেন। তিনি বলতেন, যারা নামাজ পড়ে না তারা আমার অনুসারী নয়।

অলিয়ে কামেল এই চার স্তরের সোনার চাবির বরদারই হচ্ছেন আমার পিতা ও মুর্শিদ কামেল শাহেন শাহ্, সুলতানুল আউলিয়া, সুলতানে আরেফীন দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্। দয়াল বাবা নারায়ণগঞ্জের পুরান বন্দরে তাঁর জাহাজ নোঙ্গর করেছেন। এই বন্দর থেকেই ভাসবে দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্র জাহাজ। সে জাহাজে অগণিত যাত্রী। আজ বন্দরের 'কাদরিয়া ভাণ্ডার সিরাজ শাহ্র আস্তানায়' সমবেত সবাই তাকিয়ে আছে দয়াল বাবার পবিত্র মুখের দিকে। দয়াল দয়া

করলেই কেবল তাঁর জাহাজের যাত্রী হওয়া যাবে। ওঠা যাবে পরপারের তরীতে। জাহাজের কাণ্ডারী দয়ার সাগর সিরাজ শাহ্। দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্ গায়েব জানতেন, মারেফাতের চাবি ছিল তাঁর হাতে। সাত রাজার ধনে ধনী, দয়াল আমার বসে আছেন কামেলিয়াত ও বেলায়েতের সু-উচ্চ সিংহাসালে।

সপ্তাকাশের উপরে মহান আল্লাহ্র আরশে আজীমে এবং ভূপৃষ্ঠের সাত তবক নিচে তাহাতুচ্ছায়া পর্যন্ত দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্রে দৃষ্টি প্রসারিত, ব্যাপ্ত। তিনি তুলনা বিহীন অলি। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর হাজার হাজার কেরামত মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর সে কেরামতের কথা বলার ইচ্ছা নেই। যদি কোনদিন সুযোগ হয়, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করেন বলা যাবে।

১৯৬১ সালে ২৮ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করনে। মাওলানা সিরাজুল ইসলাম মৌলভি (রঃ) এর মেয়ে মা ফয়জুন নেছাকে বিবাহের পর সংসারে তাঁদের অনেক অভাব অনটন। কিন্তু কোনদিন কারো কাছে অভাব-অনটনের কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। বাবা রাজ্জাক শাহ্ তখন 'গাউছ দরবারের' গদ্দিনশীন পীর সাহেব। তিনি তখন পরিবারের অন্যদের সাথে নারায়ণগঞ্জের দেওভোগে বসবাস করতেন। আর সিরাজ শাহ্ পাইকপাড়ায় ছোট্ট বাসা ভাড়া নিয়ে কোন রকম দিন কাটাতেন, আর এবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকতেন। এরই মধ্যে মা ফয়জুন নেছার কোল জুড়ে আসে প্রথম সন্তান আমার বড় বোন মোসাম্মৎ কামরুন নাহার বেবী। ঘরে আনন্দের জোয়ার কিন্তু এই শিশু সন্তানের জন্য দুধ কেনার মতো পয়সা তখন ঘরে নেই। তাকে দুধের পরিবর্তে চালের বাঁটা খাওয়ানো হতো। এরপর তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে আমার জন্ম। পরে জন্মগ্রহণ করে আমার ছোট বোন মোসাম্মৎ নাজমুন নাহার সীমা। আমরা সিরাজ শাহ্র এই তিন সন্তান। এই সময় দয়াল বাবা বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন ব্যবসাই তাঁকে দিয়ে সম্ভব হয় নাই। কারণ ব্যবসা করার জন্য দুনিয়াতে তাঁর আগমন ঘটে নাই। এদিকে তাঁর পিতা আবদুর রাজ্জাক শাহ্ অসুস্থ হয়ে পরলে তিনি পুত্র সিরাজ শাহ্কে দেওভোগের বাড়িতে ডেকে আনেন। তিনি সিরাজ শাহ্র নিকট তাঁর পুরো পরিবারের এবং দেওভোগ 'গাউছ দরবারের' দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে দরবারের মতোওয়াল্লী ও গদ্দিনশীন নিয়োজিত করেন। এর প্রায় চার মাস পর ১৯৬৯ সালে রাজ্জাক শাহ্ ইহলোক ত্যাগ করে মওলার সান্নিধ্যে যাত্রা করেন। পিতা রাজ্জাক শাহ্ বিদায়ের সময় সিরাজ শাহ্কে বললেন, 'আমি তো তোমাকে কোন টাকা-পয়সা দিয়ে যেতে পারলাম না। তোমার জন্য দোয়া করে গেলাম, আল্লাহ্ তোমাকে দেখবেন।' তখন এ বৃহৎ পরিবারের ভরন-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ সিরাজ শাহ্র জন্য খুব সহজ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় তিনি পিতার অর্পিত দায়িত্ব শিরোধার্য করে যথার্থভাবে তা পালন করেন।

রাজ্জাক শাহ্‌র ইহলোক ত্যাগ করার পর নারায়ণগঞ্জের গাবতলীতে তাঁর মাজার শরিফ স্থাপিত হয়। বাবা সিরাজ শাহ্ তখন নিজে দিনের পর দিন শ্রমিকদের সাথে থেকে মাজারের নির্মাণ সামগ্রী ইট-বালু বহন করে তাঁর পিতার মাজার নির্মাণ সম্পন্ন করেন।

পিতার মাজার নির্মাণ শেষে তিনি বন্দরের দিকে মনোনিবেশ করেন। কারণ তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই বন্দরে। তাঁর শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের পুরো সময়টাই অতিবাহিত হয়েছে এই বন্দরে। আর তাই তিনি বন্দরের কথা কখনো ভুলতে পারতেন না, বন্দর নিয়ে সব সময় ভাবতেন।

১৯৪৯ সলে বাবা সিরাজ শাহ্‌র একমাত্র মামা মোঃ মেছের আলী তাঁর বোন অর্থাৎ সিরাজ শাহ্‌র মাতা ছবুরুন নেসার নামে তাঁর প্রাপ্য পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ ৫৯ শতাংশ জমি হেবা করে দিতে চাইলে, বোনের ইচ্ছানুযায়ী তিনি সে অংশ 'কাদরিয়া ভাণ্ডার' এর নামে ওয়াকফা করে ভগ্নিপতি আবদুর রাজ্জাক শাহ্‌কে এর মোতওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। আবদুর রাজ্জাক শাহ্ পরবর্তীতে পুত্র সিরাজ শাহ্‌কে এ কাদরিয়া ভাণ্ডারের মোতওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। সিরাজ শাহ্ কাদরিয়া ভাণ্ডারের সাথে নিজে জায়গা খরিদ করে ১৯৮৪ইং সালে 'সিরাজ শাহ্‌র আস্তানা' নামে এই দরবার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে সিরাজ শাহ্ তাঁর একমাত্র পুত্র হিসেবে আমাকে এই কাদরিয়া ভাণ্ডারের মোতওয়াল্লী নিযুক্ত করেন ও 'সিরাজ শাহ্‌র আস্তানা' হেবা করে দিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে এর নাম করণ করা হয় 'কাদরিয়া ভাণ্ডার সিরাজ শাহ্‌র আস্তানা'। এইভাবে কাদরিয়া ভাণ্ডার সিরাজ শাহ্‌র আস্তানা কমপ্লেক্স গড়ে ওঠে। যা কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে ইনশাল্লাহ্।

বাবা সিরাজ শাহ্ ১৯৮৮ সালে প্রথম হজ্জব্রত পালন করেন। পরে ১৯৯৮ সালে তিনি আমার মাতা ফয়জুন নেছা ও আমাকে নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো হজ্জব্রত পালন করতে মক্কা-মদীনাতে গমন করেন। হজ্জ করে মক্কা-মদীনা থেকে ফিরে এসে ১৯৯৯ সালে দাতা রাজ্জাক শাহ্ (রঃ)'র ওরশের দ্বিতীয় দিন ২৬ অক্টোবর শেষ রাতে ফাতেহা পাঠের পরে তিনি আমাকে খেলাফত দান করেন।

বাবা সিরাজ শাহ্ আমাকে খেলাফত দিয়ে 'কাদরিয়া ভাণ্ডারে' পাঠিয়ে দেন। এই দিকে ২০০০ সালে তিনি পুরাতন কাদরিয়া ভাণ্ডার জামে মসজিদ ভেঙ্গে নতুন করে তা নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং পরে তিনি তা সম্পন্ন করার জন্য আমার উপর সে দায়িত্ব অর্পণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০১ সালে এ মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করি। এরপর থেকে 'কাদরিয়া ভাণ্ডার সিরাজ শাহ্‌র আস্তানা কমপ্লেক্স' এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলে। এ কমপ্লেক্সের ভিতরে ২০১৩ সালে সিরাজ শাহ্ দাতব্য চিকিৎসালয় ও ২০১৫ সালে সিরাজ শাহ্ জামে মসজিদ নামে অপর একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিরাজ শাহ্ যেই ঘরে জন্মগ্রহণ করেন সেই ঘরের জায়গাতেই বর্তমানে সিরাজ শাহ্ জামে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। এ

কমপ্লেক্সের ভেতর সিরাজ শাহ্ জামিয়া মাদ্রাসা, সিরাজ শাহ্ হাই স্কুল ও সিরাজ শাহ্ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। এসবের নামে জায়গাও খরিদ করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্-রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় তা বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ্।

আমাদের দুই পুত্র সন্তান, সিরাজ শাহ্র প্রিয় দৌহিত্র মোঃ ফয়জুল ইসলাম ইফ্তী শাহ্ আল কাদ্রী ওয়াল চিশ্তী ও ওয়াসিকুল ইসলাম মারুফ শাহ্ আল কাদ্রী ওয়াল চিশ্তী। তারা উভয়েই সিরাজ শাহ্র বড় আদরের ও নয়নের মণি। ২০১২ সালের ২৫ এপ্রিল দয়াল সিরাজ শাহ্ নিজে এ দুই দৌহিত্রকে খেলাফত দান করেন। তাঁরা উভয়েই পবিত্র, সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। তাদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনও সকলের কর্তব্য। পীরের আওলাদদের মহব্বত না করলে পীরের মহব্বত হতে দূরে সরে যায়। দয়াল সিরাজ শাহ্ বলেছেন, আমার আওলাদদের তোমরা কখনও ভুলবে না। আমার পর আমার আওলাদের সঙ্গে কে কি রূপ ব্যবহার করবে তা আমি মাজার থেকে মাথা উঠিয়ে দেখবো।

১৯৯৮ সালে বাবা সিরাজ শাহ্ দ্বিতীয় বার হজ্জে যাওয়ার সময় বলেন, আমার প্রোস্টেট ক্যানসার বাসা বেঁধেছে। প্রথমে তা কেউই বুঝতে না পারলেও পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার তাঁর ক্যানসারের কথা নিশ্চিত করেন। তিনি সব সময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে শহীদানের দরজা চাইতেন। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর মনের আশা পূর্ণ করেছেন। তিনি কোনদিনও রোগের উপর বিরক্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে পরিত্রাণ চাইতেন না। বলতেন, আল্লাহ্ খুশি তো আমিও খুশি। আল্লাহ্র উপর এমনি তাওয়াক্কুল দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্র পক্ষেই সম্ভব। তিনি প্রায় তিন বছর অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থেকেই অগণিত ভক্তের মনের বাসনা পূর্ণ করছেন এবং হাসিমুখে সবাইকে বিদায় করেছেন।

২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শনিবার বাবা সিরাজ শাহ্ সারাদিন আমার সাথে কথা বলেন এবং কাদরিয়া ভাণ্ডার সিরাজ শাহ্র আস্তানা দরবার শরীফের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেন। অতীত দিনের ও কিছু গূঢ় রহস্য নিয়ে বিভিন্ন কথা বলেন, যা এতদিন তিনি কখনো কারো কাছে প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলেন, 'তুমি আমার এই পরিবারটিকে দেখে রাখবে।' পরিবার বলতে তিনি দরবার ও তাঁর মুরিদানদের বুঝাতেন। আমি বললাম, 'আমি কি বাবা তাদের দেখে রাখতে পারবো?' তিনি বললেন, 'তুমি বাহ্যিকভাবে দেখে রাখবে, আর আমি রূহানীভাবে দেখে রাখবো।' তিনি আমাকে বলেছেন, 'আমাকে গাউছ পাক যেভাবে সর্বসময় দেখে রেখেছেন, গাউছ পাক আমার সাথে ওয়াদা করেছেন তিনি তোমাকেও তেমনিভাবে দেখে রাখবেন।' যখন দয়াল এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন মনেই হয় নাই যে তাঁর কোন অসুখ আছে। গভীর রাত পর্যন্ত তিনি একান্তে বিভিন্ন কথা বলেন। অনেক উপদেশ, মনের অনেক গোপন কথা তিনি বললেন। দুই জনের মধ্যে ভাবের

আদান-প্রদান ঘটে যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। শুধু বলা যায়– 'বিশ্বাসের বাতি জ্বেলে, আঁধার ঘরে তালাশ কর, দেখবি প্রেমিকের ভাবের আদান-প্রদান কত সুন্দর'।

ঐ রাতেই প্রায় দেড়টার সময় হঠাৎ করে দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্ খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পরেন। পরদিন দুপুরে এ্যামবুলেন্সে করে ঢাকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ-হাসপাতাল ও-হাসপাতাল করতে করতে বাবা অনেক ছটফট করছেন দেখে ডাক্তাররা তাঁকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। পরের দিন ৪ ফেব্রুয়ারি দুপুর ৩.২৬ মিনিট সোমবার দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্ মওলার উদ্দেশ্যে এই দুনিয়া ছেড়ে অন্য দুনিয়ায় পাড়ি জমান– 'বিরহ বিচ্ছেদের জ্বালা, সহিতে না পারি মৌলা, দেখা দিয়া নিভাও জ্বালা, সিরাজ শাহ্ বাবা সাল্লেআলা'।

পরদিন ৫ ফেব্রুয়ারি বাদ-জোহর জানাজা শেষে তাঁর নিজের হাতে গড়া মাজার শরীফে তাঁকে চিরদিনের জন্য সমাহিত করা হয়। ঐদিন হরতাল থাকলেও দূর-দুরান্ত থেকে অগণিত ভক্তবৃন্দ, আশেকান-জাকেরান তাঁর জানাজায় হাজির হন। তাঁদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল।

দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্ ১৯৮৩ সালে বাগদাদ শরীফে গাউছ পাকের খেদমতে গিয়েছিলেন। মুর্শিদ কেবলা দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্ বেশ কিছুদিন গাউছ পাকের খেদমতে থাকার পর দেশে ফিরে এসে ১৯৮৪ সালে 'সিরাজ শাহ্র আস্তানা'র কাজ শুরু করেন এবং নিজের নকশা করা মাজার শরীফ নির্মাণ করেন। তিনি চারদিকে চারটি সাদা গুম্বুজের মাঝখানে সবুজ গুম্বুজবিশিষ্ট এ মাজার নির্মাণ করেন।

এই মাজারের মূলভাগ তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৮৫ সালে নির্মাণ করে রাখেন। এই মাজারের উপর বসে বসে তিনি রাতে নামাজ ও ধ্যান-মোশেহেদা জিকির আজগার করতনে। আর সবসময় বলতেন, 'এই কবরেই আমাকে সমাধি করা হবে।' তাঁর মনের এই আশা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কবুল করেছেন।

'লক্ষ লক্ষ বছর আগে, বহু শতাব্দী পূর্বে–
এমন কি আদম-হাওয়ার আগেও ছিলাম আমি।
নীরব যারা, একদা তাদেরই মধ্যে ছিলাম আমি,
সে নীরবতা থেকেই আজ হয়ে উঠেছি সবাক মুখর।
গভীর গহন থেকে উঠে এলাম আমি উর্ধ্বলোকে
আমার সে মনোহর প্রেমাস্পদের সন্ধানে
আত্মার জগতে সে একজনের সাথে আমার ভালোবাসা ছিল;
এ জন্যেই আমি ফিরে গেলাম সেখানে, যেখান থেকে আমি এসেছিলাম।'
আমিন।

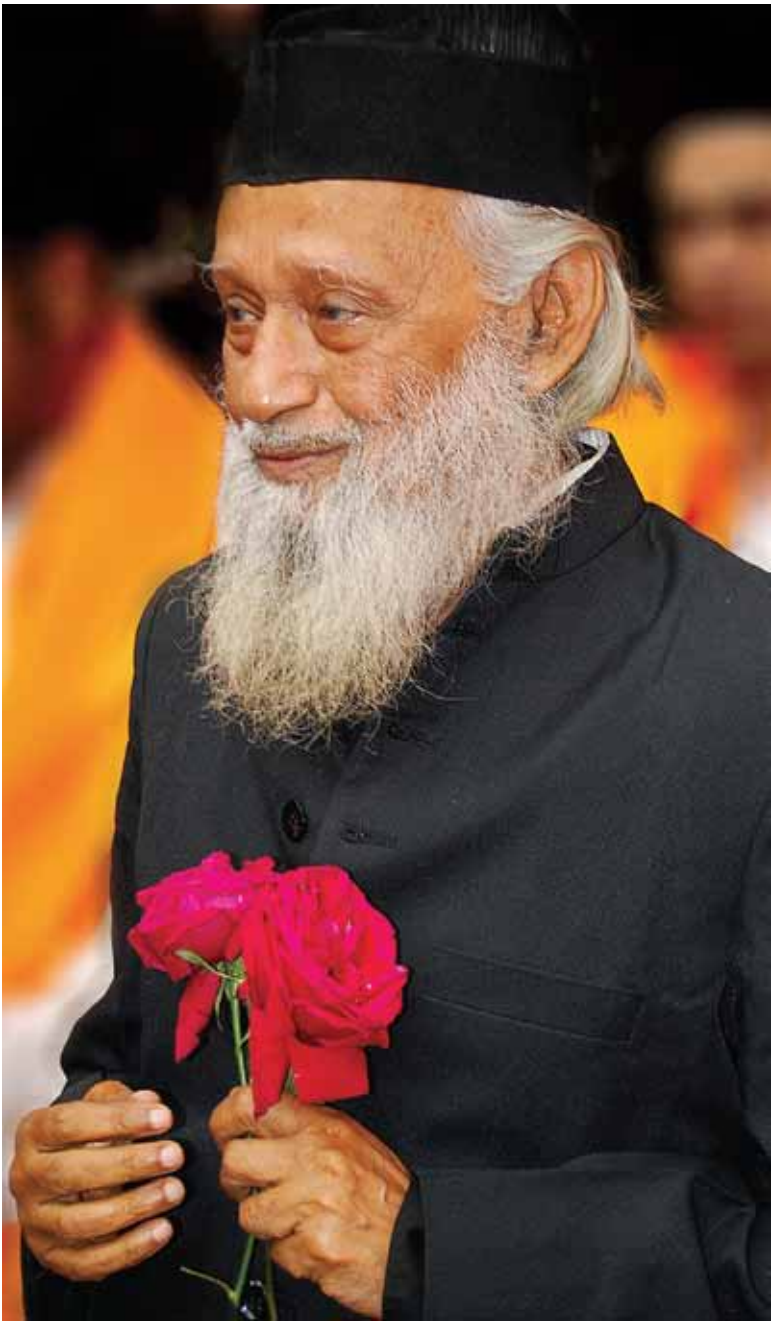

হযরত খাজা শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ)

হযরত খাজা শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ)

হযরত খাজা শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী
ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ) এর মাজার শরীফ

ইলমে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফাত চর্চাকেন্দ্র
কাদরিয়া ভাণ্ডার সিরাজ শাহ্‌র আস্তানার মূল প্রবেশ দ্বার

দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্‌র রওজায় উঠার সিঁড়ি

কাদরিয়া ভাণ্ডার দরবার শরীফ; এখানে প্রতিনিয়ত অগণিত আশেকান-মুরিদান শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফাতের শিক্ষাপ্রাপ্ত হন

অলি কাকে বলে?
আল্লাহ্‌র অলিদের কাছে যাওয়া জায়েজ কিনা?
তাঁদের হাতে নজরানা বা উপঢৌকন দেওয়া যায় কিনা?

যার মধ্যে আল্লাহ্‌র জাত নূর প্রকাশিত হয় তিনিই আল্লাহ্‌র অলি। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শরীয়ত ও মারেফাত তথা নবুয়ত ও বেলায়েত প্রচার করেন। অলি থেকে বেলায়েত। 'অলি' শব্দের অর্থ বন্ধু। সুতরাং ফকিরী দরবেশী সুফি সাধনার ক্ষেত্রে বেলায়েত শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌র নৈকট্য বা বন্ধুত্ব লাভ ও বন্ধুত্ব লাভের পথ। নফ্‌স চার প্রকার। তার মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নফ্‌সকে বলা হয়- 'নফসে ওয়াহেদ'। আল্লাহ্‌র অলিগণের নফস হল নফ্‌সে ওয়াহেদ। তাদের নফ্‌স হতে শিক্ষা-দীক্ষা লাভের ফলশ্রুতি হল জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ। 'ওয়াহু ওয়াল্লাজী আনশা আকুন্ মিন নাফছিউ ওয়া-হিদাতিন ফামুছতাক্কাররুউ মুছতাউদা', অর্থাৎ- *এবং তিনিই তোমাদের ওয়াহেদ থেকে উৎপাদন করেছেন* (সূরা- আনাম, আয়াত-৯৮)। একজন অলি বা সম্যক গুরু সবাইকে চিনেন কিন্তু তাকে মোমিন ছাড়া অন্য কেউ চিনে না। 'লা তুদরিকুহুল আবছারু, ওয়া হুওয়া ইউদরিকুল আবছার', অর্থাৎ- *দৃষ্টিসমূহ তাকে অনুধাবন করতে পারে না এবং তিনি অনুধাবন করেন সকল দৃষ্টি* (সূরা- আনাম, আয়াত-১০৩)। অলিআল্লাহ্‌গণ একজন দ্রষ্টা, কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, 'আল আউলিয়াও রায়হানুল্লাহ', অর্থাৎ- *আউলিয়াগণ আল্লাহ্‌র সুবাস*। হেদায়েত প্রাপ্তদের সঙ্গী হয়ে এবাদত না করলে কোন এবাদত আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। 'ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আলামু মাই ইয়া দ্বিল্লু আনছাবি-লিহি, ওয়া হুওয়া আলাম বিল মুহতাদীন', অর্থাৎ- *নিশ্চয় তোমার রব, তিনি জানেন তার পথ থেকে*

কে ভ্রান্ত হয় এবং হেদায়েতপ্রাপ্তদের সাথে কে আছে, তাও তিনি জানেন (সূরা-আনাম, আয়াত-১১৭)।

তোমার পিছনের পাপের কথা ভাবছ, এটি আল্লাহ্‌র মেহেরবানির কাছে বরফের মতো। মনে করো, সমস্ত পৃথিবী যদি বরফে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তবুও সূর্যের আলোর সামনে তা কিছুই নয়, অলি মুহূর্তের মধ্যে তা গলিয়ে দিতে পারেন। এভাবে তোমার পাপ যতই হোক না কেন, খোদার মেহেরবানির কাছে সবই বিলীন হয়ে যাবে। অলির ওয়াসিলায় খোদাতায়ালা মেহেরবানি করে ক্ষমা করে দিতে পারেন। একজন অলি বা মহাপুরুষ 'বর্ধিষ্ণু' হন। তাঁর সংশ্রবে এসে যারা তাঁকে অনুসরণ করে তাদের মধ্যে থেকে তিনি আরও মহাপুরুষ তৈরি করেন। এইরূপে একজন মহাপুরুষ তথা আল কেতাব চির বর্ধিষ্ণু। মহাপুরুষ দ্বারাই মহাপুরুষ তৈরি হয়। 'ওয়া হা-জা-কিতা-বুন আনযালনা-হু মুবা-রাকুন ফাওাবিউ-হু ওয়াওাক্কু-লা আল্লাকুম তুরহামুন' অর্থাৎ- *এই একটি কিতাব আমার এটি অবতরণ করেছি বর্ধিষ্ণু রূপে, সুতরাং তার অনুসরণ কর এবং কর্তব্যপরায়ন হও, যেন তোমার জন্য রহম করা হয়* (সূরা-আনাস,আয়াত-১৫৫)।

কামেল বা অলির ছোহবতে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বানিয়ে দেয়। 'নেগাহে অলিমে ইয়ে তাছির দেখি বদলতি হাজারোকি তাকদির দেখি', অর্থাৎ- *আল্লাহ্‌র অলিদের নেক নজরের মধ্যে এমন তাছির রয়েছে যে এক মুহূর্তে হাজারো তাকদির পরিবর্তন হয়ে যায়* (মোজাদ্দেত আল ফেসানী (রঃ), মকতুবাত শরীফ ১ম খণ্ড)। কিছু সময় আল্লাহ্‌র অলির পাশে বসে থাকলে রিয়া ব্যতীত একশত বছরের এবাদতের চাইতে বেশি ফল পাওয়া যায়। যদি তুমি শক্র পাথর হও বা মরমর পাথরও হও, অর্থাৎ যে রকমই হও না কেন। যদি তুমি কামেল পীরের ছোহবতে আস, তবে তুমি গওহর নামক মূল্যবান ধাতুতে পরিণত হয়ে যাবে। অর্থাৎ কামেল হয়ে উঠবে।

এজন্য পাক লোকের মুহব্বত অন্তরে রাখো 'কুনু মা আস সাদিকীন', অর্থাৎ- *আল্লাহ্‌র অলিদের সাথি হয়ে যাও* (সূরা-তওবা, আয়াত-১১৯)। এ সাথি হওয়ার অর্থ হলো তাকে মহব্বত করা ও অনুসারী হওয়া এবং তার নির্দেশ পালন করা। আবার এইরূপ লোক কোথায় পাবেন বলে নিরাশ হবেন না, কেননা আল্লাহ্‌র রহমতে প্রত্যেক জমানায় কামেল লোক পয়দা হয়। তাই নিজের দিলের খোরাক খোদার প্রেমে ঐরূপ কোন দিলের সাথে লাগিয়ে দিন যার অন্তর খোদার দিকে ফিরে আছে। কেননা ছোহবতের ক্রিয়া আছে, নেক লোকের ছোহবতে নেক হওয়া যায়। আর বদলোকের ছোহবতে বদ হয়। যে ব্যক্তি অলিআল্লাহ্ দ্বারা ফায়েজ প্রাপ্ত হয় তার আত্মার ক্রোধ থাকে না। বরং তার রোগ জুফিল্লাহ এবং হুব্বুলিল্লাহ হাসেল হয়। প্রকাশ্যভাবে পরাজয়ের সাথে চলেন। ধৈর্য্য ধারণকারী ও দানশীল হোন। অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সাহায্য

পেয়ে জয়ী হয়ে যান।

যে চক্ষু দিয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বতে অশ্রু নির্গত হতে থাকে সেই চক্ষু উত্তম এবং ঐ অন্তঃকরণ পবিত্র, যে অন্তঃকরণ সর্বদা আল্লাহ্‌র এশকে জ্বলছে। প্রত্যেক ক্রন্দনকারীর পরিণতি আনন্দময় হয়ে থাকে। যেমন- খোদাতায়ালা নিজেই ফরমান করেছেন 'ইন্নামায়াল- উছরে ইউছরা', অর্থাৎ- *কষ্টের পরই শান্তি পাওয়া যায়*। অতএব, যে ব্যক্তি পরিনামদর্শী হয়, সে অত্যন্ত পবিত্র ব্যক্তি। 'ইন্ আউলিইয়া- উহু-ইল্লাল্ মত্তাক্কুনা', অর্থাৎ- *একমাত্র মোত্তাকি খোদাভীরু লোকেরাই আল্লাহ্‌র অলি* (সূরা-আন ফাল, আয়াত-৩৪)। নবী বা অলিদের হাতে নজরানা বা উপঢৌকন দেয়া যায়। 'ইয়া আইয়ুহাল-লা জিনা আমানু ইজা নাজাইতুমুর রাসূলা ফাকাদদেমু বাইনা ইয়াদাই নাজওয়াকুম সাদাকাতান, জালিকা খায়রুল লাকুম ওয়া আতহারু, ফাইনলাম তাজেদু ফাইননাল-লাহা গাফুরুন রাহিমুন', অর্থাৎ- *তোমরা যারা ঈমান এনেছ, যখন তোমরা রাসূলের সাথে গোপনে পরামর্শ করবে সুতরাং তোমরা বাড়িয়ে দিও তার হাতের মধ্যে তোমাদের পরামর্শের জন্য উপঢৌকন, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং পবিত্রতম। অতঃপর তোমরা যদি তা না পার, সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু* (সূরা-মুজাদালার, আয়াত-১২)। কোরানের এই আয়াত দ্বারা নবী-অলির হাতে নজরানা বা উপঢৌকন দেয়া জায়েজ এবং এই নজরানা দেয়া ও নেয়া নবীর সুন্নাত।

মোর্শেদ বা পীরের হাতে বায়াত হওয়া যায় কিনা? মোর্শেদ বা পীর কোরআনে আছে কিনা?

'ইন্নাল্লাজিনা ইউবা-ইউ-নাকা ইন্নামা-ইউবা-ইউনাল্লাহা; ইয়াদুল্লা-হি ফাউকা আইদিহিম, ফামান্নাকাছা ফাইন্নামা-ইয়ানকুছু আলা নাফছিহি, ওয়ামান আউফা-বিমা-আ-হাদা আলাইহুল্লা ফাছাইউ তিহি আজরান আজিমা', অর্থাৎ- *নিশ্চয়ই যারা আপনার (নবীর) বায়াত গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহ্‌রই বায়াত গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে এইটি ভঙ্গ করে সে আপন নফসের উপরই ভঙ্গ করে (বা ভাঙ্গন লাগায়) এবং তার উপর আল্লাহ্‌র যেই অঙ্গীকার তা যেন পূর্ণ করে, তাকে শীঘ্রই তিনি আজমতওয়ালা পারিশ্রমিক দান করেন* (সূরা-ফাতাহ, আয়াত-১০)। সাহাবীগণ নবীজির কাছে বায়াত গ্রহণ করার সময় হুজুর (সাঃ) তাঁদের হাতের উপর নিজ পবিত্র হাত রাখতেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই এ আয়াতটি নাযেল হয়েছে। এখানে রাসূলের হাতকে আল্লাহ্ নিজের কুদরতের হাত বলেছেন। আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট বায়াত গ্রহণ করা আর আল্লাহ্‌র নিকট বায়াত গ্রহণ করা একই কথা। আল্লাহ্‌তালাই রাসূল রূপে এবং কামেল মোর্শেদ রূপে সর্বযুগে বিরাজ করেন। সুতরাং আল্লাহ্ ও রাসূলকে পৃথক ধারণা করা ভুল ও কুফরি। যারা এই কথা বিশ্বাস করে তাদেরকে 'আজমত ওয়ালা' পারিশ্রমিক অর্থাৎ মানসিক বা আত্মিক উন্নতিমূলক পারিশ্রমিক আল্লাহ্ দান করবেন। এতেই আল্লাহ্‌র সাথে নবীজির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত আয়াতের মর্মে এ কথারও প্রমাণ পাওয়া যায় যারা মোর্শেদের হাতে বায়াত গ্রহণ করেন তারা প্রকৃতপক্ষে নবীজির হাতেই বায়াত গ্রহণ করেন। সুতরাং প্রমাণিত যে, নবীজির হাতে বায়াত হলে এই বায়াতে 'বাইআতুল্লাহ' হয়। আর মোর্শেদের হাতে বা পীরের হাতে বায়াত হলে এই বায়াত বা শেখ-ই 'বায়াতুর

রাসূল' হয়। এটিকে আরবীতে বলা হয় 'বি ওয়াছিতাতে খোলাফায়িহি' বা রাসূলের প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে রাসূলের বায়াত। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হলেন রাসূল এবং রাসূলের প্রতিনিধি হলেন শেখ বা পীর-মোর্শেদ। প্রতিনিধির কাছে বায়াত গ্রহণ করলে এটাই মালিকের বায়াত বলে গণ্য হয়। প্রমাণ তাফসীরে রুহুল বায়ান ও তাফসীরে সাভী-উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা। বায়াতের হাকিকত হলো-'আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা।' এটি একটি শক্ত রশির মতো। যার এক মাথা রাসূলের হাতে, অপর মাথা আল্লাহ্‌র হাতে। অনুরূপভাবে মোর্শেদের হাতে থাকে নিম্ন মাথা এবং রাসূলের হাতে থাকে উপরের মাথা। (তাফসীরে সাভী, ২৬ পারা- উক্ত আয়াতের ব্যখ্যা।)

অনেকে বলেন, কোরআন-হাদীসে পীরের (মোর্শেদ) বায়াত হওয়া সংক্রান্ত স্পষ্ট কোন আদেশ পাওয়া যায় না। সুতরাং পীর ধরা মোস্তাহাব বা মোবাহ হবে। এটি ওয়াজিব বা ফরজ নয়। কোরআন পাকে মোর্শেদ (পীরের) তরিকা প্রহণ করার জন্য কি আদেশ আছে?

আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেছেন 'ইয়া আইউহাল-লা জিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াছিলাতা ওয়া জাহেদু ফি ছাবিলিহি লা-আল্লাকুম তুফলিহুন' (সূরা-আল মায়িদা, আয়াত-৩৫)। এই আয়াত শরীফের উসিলা শব্দ দ্বারা মোর্শেদ বা পীর বুঝানো হয়েছে। 'আ-আরজ্জুলিহিন্না অলা-ইয়াছিনাকা ফি-মারূফিন ফাবা ইহুন্না অস্তাগফির লাহুন্নাল্লা-হা ইন্নালা-হ গাফুরুর রাহিম' (সূরা-মুমতাহেনাহ, আয়াত-১২ শেষের দিকে)। অর্থাৎ- *ধর্মীয় ব্যপারে নবীকে অমান্য করবে না, তবে তাদেরকে বায়াত কর। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও। আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী দয়ালু*। অন্য আয়াত শরীফে আছে 'ওয়ামা ইউদলিল ফালান তাজিদালাহু ওয়ালিয়াম মুর্শিদা' (সূরা-কাহ্‌াফ, আয়াত-১৭)। অর্থাৎ- *আল্লাহ্‌ যাকে গোমরা বানাবেন তার না মিলবে অলি না মিলবে মুর্শিদ (পীর)*। এখানে আল্লাহ্‌পাক পথভ্রষ্টদের মোর্শেদ না পাওয়ার ইঙ্গিত করেছেন। বুজুর্গগণ এই আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, যাদের পীর নেই তাদের পীর শয়তান। তারা কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী পথভ্রষ্ট। মিশকাত শরীফের হাদীস রয়েছে 'যে ব্যক্তি বায়াত ছাড়া মৃত্যুবরণ করে তার মূর্খতার মৃত্যু।' পবিত্র হাদীস 'লা ইয়াক বালুল্লাহ তায়ালা ইবাদিতিল আব্দি বি গায়রি মাবিফাতিল্লাহি তায়ালা ইসফানা আল ফাসানা', অর্থাৎ- *ইলমে মারেফাত ব্যতীত যদি কেউ হাজার বছর ইবাদত করে তবুও সে আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে না*। সে ইলমে মারেফাতের শিক্ষাগুরু হচ্ছেন পীর (মুরর্শিদ)। যাত্রার আগেই পথের সাথী নির্বাচন করতে হবে।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাকে দুই প্রকার ইবাদতের যোগ্যতা দান করেন। যেমন এজতেবার পথে ও এনাবতের পথে। 'আল্লাহ্‌ ইয়াজতাবি ইলায়হি মাইয়াশাও ওয়া ইয়াহদি ইলায়হি মাই ইয়ুনিব' (সূরা-আশশুরা, আয়াত-১৩)।

অর্থাৎ- *আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বয়ং মনোনীত করেন*। নবীগণকে এবং তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দাগণকে আল্লাহ্ একতেবার পথে (নিজে ইচ্ছা করে) মনোনীত করে গ্রহণ করে থাকেন। এদের পীরের প্রয়োজন হয় না। সরাসরি আল্লাহ্ তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে পথপ্রদর্শন করে থাকেন। উম্মতে মোহাম্মদীর মাদারজাত অলি-আউলিয়াগণ জামানার মুজাদ্দেদগণ আল্লাহ্র বিশেষ বিশেষ বান্দা। তা সত্ত্বেও তারা পীরের বায়াত গ্রহণ করে থাকেন। যেমন যুগশ্রেষ্ঠ মাদারজাত অলি হযরত বড়পীর সৈয়াদ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ), মোজাদ্দেত আলফেসানী (রঃ)। আরও অনেকেই পূর্ব নির্ধারিত এবং আল্লাহ্ পাক কতৃক মনোনীত আউলিয়া ছিলেন। তথাপি তরিকতের নেছবত হাসিল করার জন্য তাঁরাও বায়াত হয়েছিলেন।

কিতাব দেখে ইবাদতের অবকাঠামো সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়, তবে ইবাদতের পথে গতি করতে হলে ইবাদতের তরিকা শিক্ষা করতে হয়। তরিকতের মধ্যে রয়েছে ইবাদতের যোগ্যতা অর্জন করার পদ্ধতি। শরীয়ত হাকিকত এবং মারেফাত রয়েছে তরিকতের মধ্যে। হাকিকত ও মারেফাত এ দুটি জ্ঞান মস্তিস্ক প্রসূত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার দ্বারা জাগ্রত হয় না। এইসব জ্ঞান অন্তরে বুঝতে হলে আত্মিক-আধ্যাত্মিক বুদ্ধি বা চৈতন্যের প্রয়োজন। যাদের আত্মিক চৈতন্য নেই তারা ধর্মের প্রকৃত হাকিকত ও মারেফাত সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইলমে মারেফাতের জ্ঞানে পরিপূর্ণ সিদ্ধ না হলে ইবাদতের কামেলিয়াত জন্মে না। বিকৃত আত্মার দোয়া এবং তওবা আল্লাহ্র পবিত্র জাত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আত্মা যদি ফুল হয় তবে দোয়া তার ঘ্রাণ স্বরূপ। বিকৃত আত্মার ঘ্রাণ পঁচা ফুলের দুর্গন্ধের মতো, তা আল্লাহ্র বিরক্তির কারণ হয় এবং আল্লাহ্র রেজা লাভের অনুপ্রেরণা হতে বা তাঁর রেজা লাভ করার আশায় যেসব কাজ করা হয় তাতে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয় এবং আত্মার উন্নতি ও মঙ্গল সাধন হয়।

এলমে মারেফাতের জ্ঞান আল্লাহ্র কামেল বান্দা (আমানু) এবং অলিদের মধ্যে আছে; যিনি ইহজগতের খেয়াল থেকে মৃত এবং আল্লাহ্র ধ্যানে জীবিত। এরূপ ব্যক্তির কাছে দ্রুত গিয়ে কোনরূপ সন্দেহ না করে তাঁর উপদেশ অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। তা হলে মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়ে যেতে পারবে। ফখর বা অহংকার থেকে মৃত্যুবরণ কর, তবেই কামেলের ফায়েজের বরকতে মারেফাতের আলো দ্বারা রূহকে তাজা করতে পারবে এবং তাঁর নিজের মতো তোমাকেও সৌন্দর্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন।

অতএব পাথরের মতো শক্ত হয়ো না, মাটির মতো নরম হও, তবেই নানা প্রকার রঙের ফুল ও ফল জন্মাবে। নম্রতা ও সভ্যতা অবলম্বন কর, জীবনভরেই অত্যাচার করেছ, পরীক্ষা করার জন্য কয়েকদিন মাটি হয়ে দেখ। তবে মানুষের মধ্যে যারা সরল তারাই ইনছানে কামেলের বাণীতে আকৃষ্ট হন, আর যারা কুটিল বা শয়তানী

প্রকৃতি বিশিষ্ট তারা আদৌ আকৃষ্ট হয় না, বরং ঐটি তাদের অত্যন্ত অপ্রিয়।
শব্দ চয়ন, উত্তেজিত ভাষণ এবং অনুষ্ঠানসমূহের ব্যাখ্যা দেবার অনেক প্রকার উপায় আছে, কিন্তু এগুলোর সাহায্যে কামেল হওয়া যায় না এবং জন্ম চক্র হতে মুক্তি লাভ করা যায় না। ধর্মের ব্যাখ্যা দেবার সময় এই ধরনের নিয়মগুলো নিয়ে তারা কেবলই নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাতে চায়। তারা চায় সাধারণ মানুষ তাদেরকে মহাপণ্ডিত বলে সম্মান করুক। যদিও মেনে নেই যে, এই ধরনের কাজের দরকার আছে। কিন্তু মারেফাতের রাজ্যে প্রবেশের প্রশ্নে এর কানাকড়িও দাম নেই। এরকম শব্দ আর ব্যাকরণের মধ্যে ডুবে থাকে আর অনুষ্ঠানই মূল বিষয় বলে জানে তাদের মধ্যে থেকে একজন কামেল পুরুষ বের করে আনা যাবে না। কামেল পীর বা অলির লক্ষ্মণ চেনা ভয়ঙ্কর কষ্টকর। একজনকে মুরিদ করার ইচ্ছা না থাকলে কামেল পীর এমন সব উল্টা-পাল্টা ব্যবহার এবং চলাফেরার আজব ঢং দেখাবে যে, সেই মুরিদ হবার আশায় আসা লোকটি বেখাপ্পা, অমিল-বেমিল দেখে আপনিই পালিয়ে যাবে।
তাই ইচ্ছা থাকলেই যে সবার কপালে পীর জোটে তা বলা যায় না। তাই ঈমান ঠিক করে একজন খাঁটি কামেল লোকের অনুকরণ করা চাই। তাঁদের পায়ের ধূলা হয়ে যাও এবং হিংসা অহংকারের মাথায় লাথি মেরে আমার মতো সিরাজ শাহ্‌র অনুসরণ ও গোলামী করো। বুদ্ধি ও খেয়াল তেজ করলেই খোদাকে পাওয়া যায় না। নম্রভাবে বাধ্যতা স্বীকার করলেই খোদাতায়ালা কবুল করে নেন।
যাদের অন্তরে শয়তান, জিনিয়াত এবং নফসানিয়াত প্রবল তারা কামেল অলি বা পীরদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। এমন কি পীরদেরকে বাবা বললে তাদের অন্তর জ্বলে উঠে। ছোট এবং বড়দেরকে বাবা বা মা বললে তাতে তাদের খারাপ লাগে না কিন্তু পীরকে বাবা বললে তাদের খারাপ লাগে। আমাদের জন্মদাতা পিতা ও মাতার ওয়াসিলায় আমরা শরীর পেয়েছি এবং পীর-মোর্শেদ পেয়েছি। আর পীর হলো আমাদের রূহানী পিতা। যেই দিন থেকে তাঁর কাছে মুরীদ হয়েছি, সেই দিন থেকে তিনি আমাদের রূহানী বাবা (পিতা)। তাঁর ওয়াসিলায় আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলকে পাব। এই জন্য আমরা পীরকে বাবা বলি কিন্তু তাতে তাদের খারাপ লাগে তাই তারা পীর ও আউলিয়াদের সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অহেতুক বিষোদ্‌গার করে এবং নিন্দা ও গীবত তাদের সার্বক্ষণিক কাজ। এর কারণ হচ্ছে ফানাপ্রাপ্ত অলিগণ আল্লাহ্‌র গুণে গুনান্বিত হন। আল্লাহ্‌র গুণের প্রভাব মানব-শয়তান, নফস-শয়তান, জিন এবং খান্নাছ-শয়তানের জন্য পীড়াদায়ক। শয়তানী তাছিরপ্রাপ্ত দুষ্ট ব্যক্তিগণ তাই আউলিয়াদের উপস্থিতি বা প্রভাবে পীড়া অনুভব করে থাকে এবং তার অন্তর্গত প্রতিক্রিয়ায় তাদের সাথে শত্রুতায় মেতে উঠে; যদিও অলিগণ তাদের কোন ক্ষতি করেন না। তাকাব্বরী অহংকার এসব শয়তানী কুখাছালত, আউলিয়া দর্শনমাত্র দুষ্ট লোকের অন্তরে

জাগ্রত হয়ে উঠে।

কোন শরাবখোর, জেনাকারী, কাফের, বে-দ্বীন বা বদলোকদের প্রতি তাদের তদ্রূপ অন্তরদাহ কখনও অনুভূত হয় না যেমনটি অলি আল্লাদের প্রতি হয়ে থাকে। শয়তানের প্রভাব দোষে দুষ্ট নফসের প্রছন্ন অন্তরদাহই ঐ প্রকার বৈরী চেতনার নিভৃত কারণ, কিন্তু দুষ্টজন তা বুঝতে পারে না।

তাই সাধক বা মুরিদ নানা বাধা-বিপত্তির প্রাচীর, ভঙ্গুর কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হতে অভিসারে ছুটে যায় সম্মুখে। কোন বাঁধাকেই সে বাঁধা বলে মনে করে না। এসব প্রতিকূলতার সঙ্গে নিরলস জিহাদে লিপ্ত থেকে সে তাঁর মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে চেষ্টা করে। মুরিদের এই প্রেম পেয়ালার 'সাকি' তার শিক্ষক, তার পীর (মোর্শেদ)।

পীর হচ্ছেন সুফি সাধকের রাহনুমা বা পথপ্রদর্শক। ইসলামী আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে পীর হলেন শরিয়ত ও হকিকতের শিক্ষক। আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্যই পীর-মোর্শেদ প্রদর্শিত রাসূলের পথে এ পথ পরিক্রমা। বস্তুত আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্যে এ সবই ওয়াসিলা বা 'মাধ্যম' মাত্র। নবী বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলার বান্দাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছেন, তারা নবীও নহেন, শহীদও নহেন, অথচ তারা কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তাআলার নিকট অধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন এরা কারা? উত্তরে নবীজি বললেন, তারা অলি-আউলিয়া (পীর-মোর্শেদ) গণ।

এই সব অলি আল্লাগণের বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআনে ঘোষণা করেন 'নাহনু আউলিয়াউকুম ফিল হায়াতি দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ' (সূরা-হামিম, আয়াত-৩১)। অর্থাৎ আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। কোরআন ও হাদিসে অলি ও পীর (মোর্শেদ) আছে তা মানা ও স্বীকার করা আমাদের জন্য কর্তব্য।

হযরত খাজা শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ)

দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্‌র জন্মগৃহ স্থানে প্রতিষ্ঠিত সিরাজ শাহ্ জামে মসজিদ

কাদরিয়া ভাণ্ডার মহিলা এবাদতখানা; এখানে দরবারের মহিলা আশেকান ভক্তবৃন্দ জিকির-আসগার ও এবাদতে নিমগ্ন থাকেন

কাদরিয়া ভাণ্ডার দরবার শরীফের পাঠাগার

সিরাজ শাহ্ দাতব্য চিকিৎসালয়; এখানে প্রতি বৃহস্পতিবার অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা রোগীদের চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়

হযরত খাজা শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ)

নবী বা আউলিয়া কেরামের ইন্তেকালের আগে বা পরে তাঁর ওয়াসিলা ধরা শরীয়ত মতে জায়েজ কি না? মোর্শেদ, পীর বা অলির দরবারে যাওয়া যায় কি না?

আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণকে স্মরণ করে তাঁদেরকে মাধ্যম বানিয়ে বরকত লাভ করার নাম ওয়াসিলা। আল্লাহ্‌তায়ালার মকবুল বান্দাগণ, তাঁদের সত্ত্বা, তাঁদের নাম ও তাঁদের তাবারুকসমূহ হচ্ছে, সৃষ্টিকুলের ওয়াসিলা। তার প্রমাণ পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ, নবী করিম (সা:) এর হাদীসসমূহ, বুজুর্গদের অভিমতসমূহ, উম্মতের ঐক্যমত (ইজমা) যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি, ইত্যাদি।

নবী ও আউলিয়া কেরামকে ওয়াসিলা ধরা, তাঁদের নিকট ফরিয়াদ করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা- ইহকালীন ও পরকালীন- উভয় ক্ষেত্রেই শরীয়ত মতে জায়েজ। আহলে সুন্নতকে হাদীস শরীফে ছেওয়াদে আজম বা সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের দল বলা হয়েছে। তাদের ঐক্যমত বা ইজমা সত্যের দলিল। কেন না অসত্যের উপর সকলে একমত হতে পারে না। তাঁদের ইজমা ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত। মানুষ সমস্যা সংকটে ও অভাব-অনটনে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে। এটি হলো প্রার্থনার সর্বোচ্চ স্থল। অতঃপর নবী-রাসূল ও অলি-আউলিয়াদের নিকট 'রূহানী এসতেমদাদ' বা আত্মিক সাহায্য প্রার্থনা করার অথবা জাগতিক বিভিন্ন বৈধ বিষয়ের প্রয়োজনে সংসারে একজন আরেক জনের সাহায্য প্রার্থনার চাওয়ার বৈধতার বিধান ইসলামে দেওয়া আছে। সাহাবায়ে কেরাম জাগতিক ও পরলৌকিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবী করিম (সাঃ) এর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

অনুরূপভাবে নবীজির ইন্তেকালের পরে ও মুসলমানগণ রওজা শরীফে গিয়ে

নবীজির নিকট সমস্যা ও সংকটে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। এইরূপ বহু ঘটনার বিবরণ রয়েছে, যা নাকলান, আকলান ও কাশফ সূত্রীর গ্রহণযোগ্য দলিল। সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মহান সাহাবি 'হযরত রাবীআ ইবনে কাব আসলামী (রাঃ) একবার হযরত নবী করিম (সাঃ) এর নিকট বেহেশতে তাঁর সঙ্গে থাকার প্রার্থনা করেছিলেন এবং দয়াল নবী (সা:) তাঁর সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন' (মুসলিম শরীফ)। উল্লেখ্য যে, হযরত নবী করিম (সাঃ) কে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে ওয়াসিলা ও সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করার এবং তাঁর নিকট ফরিয়াদ ও সাহায্য মদদ তলব করার তরীকা সৃষ্টি আদিকাল থেকেই চলে আসছে। নবী করিম (সাঃ) ফরমান, যখন আদম (আঃ) ভুল করে বসলেন তখন তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহ্ আপনি মোহাম্মাদ (সাঃ) এর ওয়াসিলায় আমাকে ক্ষমা করুন। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে, 'ফাতালাক্কা-আ-দামু মিররাব্বিহী কালিমা-তিন ফাতা-বা আলাইহ ইন্নাহু হুযাওউয়্যা-বুর রাহীম' (সূরা-বাবারা, আয়াত-৩৭)। অর্থাৎ- *অতঃপর আদম (আঃ) নিজ প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কলেমা শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেন এবং তার ওয়াসিলায় আল্লাহ্ তাঁর তওবা কবুল করলেন*। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। নবী করিম (সাঃ) এর রুহ মোবারকে তাঁর পবিত্র দেহ ধারণের বহু পূর্বে আদম (আঃ) তার ওয়াসিলা গ্রহণ করে নাজাত লাভ করেছিলেন। এই মহিমান্বিত গৌরব এক মাত্র নবী (সাঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবী বা অলিকে দেয়া হয় নাই। এটা ছিল দয়াল নবী (সাঃ) এর জন্য খাস ব্যবস্থা।

এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ওয়াসিলা গ্রহণ ও সুপারিশ সকল নবী ও আউলিয়াদের জন্য প্রমাণিত আছে। এ ধরণের ওয়াসিলা বা সাহায্য প্রদান নবী করিম (সাঃ) এর সাথে নিবিড় সম্পর্কের কারণে তাঁর অনেক অনুসারী গোলামের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এ ধরনের ওয়াসিলা গ্রহণ শরীয়তসম্মত। হাদীস শরীফ এবং বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা এটা প্রমাণিত। একথা প্রমাণের জন্য সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়া কেরামের কারামত ও তাসরূফই (হস্তক্ষেপ) যথেষ্ট।

তাছাড়া সালেহীন উম্মতের ওয়াসিলা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেণির আলেমদের ও ঐক্যতম রয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের কারণেই আপন বান্দাদেরকে রহম করেন। অতএব ঐ সব নেক বান্দাগণকে ওয়াসিলা ধরার সরল অর্থ হচ্ছে তাদেরকে মাধ্যম ধরে মনোবাসনা পূরণের জন্য এবং মাকসুদ হাসিলের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করা। কেননা, তাঁরা আমাদের তুলনায় আল্লাহ্র অতি নিকটে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের দোয়া ও সুপারিশ কবুল করে থাকেন।

আউলিয়া কেরামকে ওয়াসিলা ধরার অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা- ইমাম তিরমিজি, ইমাম নাছায়ী, ইমাম বায়হাকী ও ইমাম তাবরানী সহীহ সনদের মাধ্যমে সাহাবি হযরত উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ওসমান

ইবনে হানিফ (রাঃ) বলেন, 'এক অন্ধ সাহাবি নবী করিম (সাঃ) এর খেদমতে এসে আরজ করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। তিনি যেন আমার অন্ধত্ব দূর করে দেন।' হুজুর আকরাম (সাঃ) তাঁকে বললেন, 'যদি তুমি চাও তাহলে আমি দোয়া করবো। আর যদি ইচ্ছা করো, তাহলে সবুর করতে পারো, এটা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে।' উক্ত সাহাবি বললেন 'বরং আপনি আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য দোয়া করুন।' তাঁর অনুরোধে নবী করিম (সাঃ) তাঁকে উত্তমরূপে অজু করে এই দোয়া পড়তে শিখিয়ে দিলেন, 'হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং তোমার নবী যিনি রহমতের নবী- সেই নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ওয়াসিলা করে তোমার দিকে আমি মুতাওয়াজ্জাহ (মনযোগী) হলাম। হে প্রিয় মোহাম্মদ (সাঃ) আমি আমার এই মাকসুদ পূরণের জন্য আপনার মাধ্যমে (ওয়াসিলায়) আল্লাহ্‌র দিকে মুতাওয়াজ্জহ হলাম। হে অল্লাহ, তুমি আমার মাকসুদ পুরণের ব্যাপারে হুজুর (সাঃ) এর সুপারিশ কবুল করো।' এই দোয়া করে ঐ সাহাবি চলে গেলেন। তারপর পুনরায় ফিরে আসলেন। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তাঁর চক্ষু ভালো করে দিয়েছেন। বায়হাকীর বর্ণনায় আছে- উক্ত সাহাবি উঠে দাঁড়াতেই তাঁর চক্ষু ভালো হয়ে গেলো।

এই হাদিসের মাধ্যমে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে অন্ধত্ব দূর করার জন্য, সাহাবি একবার আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করেছেন। আর একবার নবী করিম (সাঃ) কে সম্বোধন করেছেন। এই ভাবে সম্বোধন করা জায়েজ। হাদিস বিশারদগণ বলেছেন- এই হাদীসে নবী করিম (সাঃ) কে ওয়াসিলা করে দোয়া করা এবং নবী করিম (সাঃ) কে সম্বোধন করে ডাক দেওয়া ও নবীর দরবারে গিয়ে দোয়া চেয়েছেন ইত্যাদির প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, 'কখনও অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত উমর (রাঃ) হুজুর পাক (সাঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এর ওয়াসিলা ধরে বলতেন, 'হে অল্লাহ্ ইতিপূর্বে যদি কখন ও অনাবৃষ্টি দেখা দিত তখন আমরা নবী করিম (সাঃ) এর ওয়াসিলা ধরে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতাম আর আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আপনার প্রিয় নবীর চাচার ওয়াসিলা ধরে বৃষ্টি কামনা করছি, আপনি আমাদের জন্য বৃষ্টি নাজিল করুন। সাথে-সাথেই বৃষ্টি হতো।

অনুরূপ কেয়ামতের ভয়ঙ্কর দিনে নবী ও অলি-আউলিয়াদের উম্মতের জন্য ওয়াসিলা হওয়ার এবং সাহায্য করার (শাফায়াত করার) বহু প্রমাণ রয়েছে। এ সব বিবরণ আকায়েদের কিতাবগুলোতে বর্ণিত আছে। আলমে বারজাখ বা কবর জগতে থাকা অবস্থায় কোন প্রকার সাহায্য করা বা তাসাররূফ করা একমাত্র নবীদের জন্যই খাস বরং আউলিয়াকেরাম ও সালেহীননদের পক্ষেও তা সম্ভব। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে কোন লোকের মৃত্যুর পর ও তার রুহের মৃত্যু ঘটে না বরং

রুহ স্থায়ীভাবেই থেকে যায় এবং সেই অবিনশ্বর আত্মা জীবদ্দশার ন্যায় সাহায্য করতে পারে ও তাসাররূফ করতে পারে। সুতরাং তাঁদের ইন্তেকালের পর তাঁদের ওয়াসিলা ধরাতে কোন বাঁধা নিষেধ নেই।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'মসনদে সাহাবি'তে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ননা করে উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামের পরিপূর্ণ হেদায়েতের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন এমন ব্যক্তিবর্গ কবরলোক হতে জীবিত অবস্থায় স্বজনদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করে চিরন্তন উপকার সাধন করতে পারেন। আল্লাহ্‌র অলিদের নিকট তাদের জীবিতকালে অথবা ইন্তিকালের পর সাহায্য প্রার্থনা করার এবং তাদের সেই সাহায্য করার আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতার সপক্ষে শরীয়তের অনেক দলিল প্রমাণ রয়েছে।

'রাওয়াহুত তিবরানী ফিল আওয়াত' সংকলনে গ্রন্থিত হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন, '*তোমরা আমার উম্মতের মধ্যে যারা দয়াশীল (অলিআল্লাহ্) তাদের কাছে, তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য খোঁজ নাও। আশা করা যায়, তাতে তোমরা রিজিক লাভ করবে ও মুক্তি পাবে।*' অন্যত্র রাসূল (সাঃ) বলেন 'তোমরা তোমাদের মঙ্গল ও প্রয়োজনের বিষয়গুলো উত্তম চেহারার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অলিদের নিকট অন্বেষণ করো। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণিত আরেক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌পাকের এমন অনেক বান্দা রয়েছেন যাদেরকে তিনি মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্ধারণ করেন। তাদের কাছে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত মনে কাতর কণ্ঠে প্রয়োজনের বিষয়সমূহ অবহিত করবে।' তারা হলেন আল্লাহ্‌র আযাব হতে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত বান্দা- (রাওযাহুত তিবরানী ফিল কাবির) আল্লাহ্‌র অলিগণ জীবদ্দশায় হোক অথবা দৃষ্টির অন্তরাল থেকে অথবা ইন্তেকালের পর বারজাখী জগত থেকে দোয়া-প্রার্থীদের সাহায্য করেন। একথা প্রকৃতই সত্য এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তার 'তাকমিলুল ঈমান' গ্রন্থে বলেন, 'যে সকল আউলিয়া কেরামের জীবদ্দশায় তাঁদের ওয়াসিলা গ্রহণ করা হয় এবং তাদের নিকট সাহায্য ও বরকত অন্বেষণ করা হয়, ইন্তেকালের পরেও সেইভাবে তাঁদের ওয়াসিল গ্রহণ ও তাদের নিকট সাহায্য ও বরকত অন্বেষণ করা জায়েজ।'

আল্লাহ্‌র অলিদের ইন্তেকাল পরবর্তী আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র অলিদের রুহানী ও জেসমানী এ-দুই অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।' এই জন্যেই বলা হয় যে, 'আল্লাহ্‌র অলিগণ মৃত্যুবরণ করে না। বরং তারা এক জগত হতে অন্য জগতে স্থানান্তরিত হয় মাত্র' (মেরকাত শরীফ) কবরবাসীদের মধ্যে যারা সালেহীন তাঁদের ওয়াসিলা ধরবে মনোবাসনা পূরণ এবং গুনাহ মাগফিরাতের জন্য এবং তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র দরবারে খুব বেশি-বেশি করে ওয়াসিলা বানাবে। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালা এই দুনিয়াতে তাদের মাধ্যমে যতটুকু

ফায়দা বা কল্যাণ প্রদান করেছেন তার চেয়ে ও বেশি কল্যাণ বা ফায়দা দান করবেন পরকালে।

সুতরাং যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন তাঁদের মাজারে গমন করে এবং তাদের ওয়াসিলা হিসাবে গ্রহণ করে। কারণ তারা হলেন আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'অমা-আছালনা-মিররাছুলিন ইল্লা লিইউত্বাআ বি ইজনিল্লাহি অলাউ আল্লাহুম ইজ্জালামু-আনফুছাহুম জ্বা-উকা ফাস্তাগ্বফারুল্লাহা-অস্তাগ্বফারা লাহুমর রাছুলু লা অজ্বাদুল্লাহ-হা তাওয়া-বার রাহীম।' অর্থাৎ- যখন এসব লোক নিজের আত্মাসমূহের উপর অত্যাচার করে (হে হাবীব) (সাঃ) যদি আপনার দরবারে এসে হাজির হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আপনিও (ইয়া রাসূলাল্লাহ) তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে এরা আল্লাহ্তায়ালাকে তওবা কবুলকারী, মেহেরবান পাবে। (সূরা-নিসা, আয়াত-৫৪) এই আয়াতে করিমা দ্বারা একথা জানা গেল যে, হুজুর (সাঃ) প্রত্যেক গুনাহগারের জন্য প্রত্যেক সময় কিয়ামত অবধি মাগফেরাত (ক্ষমা) এর ওয়াসিলা।

'ইয়া-আইয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানুত্তক্কুল্লাহা অবতাগু - ইলাইহিল অছীলাতা অজ্বা-হিদু ফীছাবীলিহী লা আল্লাকুম তুফলিহুন।' অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং প্রতিপালকের প্রতি ওয়াসিলা তালাশ কর এবং তার পথে জেহাদ কর, যাতে করে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা-মায়েদা, আয়াত-৩৫) এই আয়াতে করিমা থেকে বোঝা গেল যে, আমলসমূহ ছাড়া ও আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় বান্দাদের ওয়াসিলা তালাশ করা অপরিহার্য। কেননা আমলসমূহের কথাতো (আল্লাহ্কে ভয় কর) উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু এর পর ওয়াসিলা তালাশ করার হুকুম দিয়েছে। তাই বুঝা গেল যে, এ ওয়াসিলা হচ্ছে আমলসমূহের অতিরিক্ত।

'কুল ইয়াতাওয়াফ্ফা-কুম মালাকুল্ মাউতিল্লাজী।' অর্থ্যাৎ- *বলে দিন, তোমাদেরকে মালাকুত মউত ওফাত দেবে, যাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে* (সূরা-সেজদা, আয়াত-১১)। জানা গেল যে মালাকুল মউত (আঃ) এর ওয়াসিলায় প্রাণ বাহির হয়।

হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত মরিয়ম (রঃ) কে বলেছিলেন যে, 'কালা ইন্নামা-আনা রাছুলু রাব্বিক লি আহাবা লাকিগুলামা যাক্কিয়্যা।' অর্থাৎ- *আমি তোমার প্রভুর দূত হই। এজন্য এসেছি যে, তোমাকে পবিত্র পত্র দান করব* (সূরা-মরিয়ম, আয়াত-১৯) জানা গেল যে, হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর ওয়াসিলায় পুত্র অর্জিত হয়েছে। হযরত মরিয়ম (রঃ) কে অমৌসুমী ফল খেতে দেখে হযরত যাকারিয়া (আঃ) মরিয়ম (রঃ) এর নিকট দাঁড়িয়ে সন্তানের জন্য দোয়া প্রার্থনা করলেন (সুরা আল-ইমরান, আয়াত-৩৮-৩৯) জানা গেল যে অলির কাছে দাঁড়িয়ে

দোয়া প্রার্থনা করা অধিক কবুল হওয়ার কারণ বা মাধ্যম (ওয়াসিলা)।
হাদীসে আছে 'আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা ইয়া মউত।' অর্থাৎ- *আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা মরে না, তাঁরা চির অমর।*
তাই কবরবাসী আল্লাহ্‌র অলিদের নিকট অত্যন্ত অনুনয় বিনয় প্রকাশ করবে এবং নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাদের কাছে দোয়ার মোহতাজ হবে। আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তাঁদের বরকতে আল্লাহ্‌পাক তোমাদের দোয়া কবুল করবেন, কারণ তাঁরাই হচ্ছেন আল্লাহ্‌পাকের খোলা দরজা। আর আল্লাহ্‌পাকের প্রচলিত বিধান বা রীতি এই যে, তিনি তাঁদের মাধ্যমেই উদ্দেশ্য পূরণ করেন। ইন্তেকালের পর কোন নবী অথবা অলিগণকে ওয়াসিলা করে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ও তাঁদের দরবারে যাওয়া শুধু জায়েজই নয়, বরং সাহাবিগণের সুন্নাতও বটে।

মাজার কাকে বলে?
মাজারে যাওয়া জায়েজ বা বৈধ কিনা?
অলির ওয়াসিলা দিয়ে মাজারে কিছু চাওয়া যায় কি না? মহিলারা মাজারে যেতে পারেন কিনা?
অলির মাজারে চুমু দেয়া যায় কিনা?

যে সকল পবিত্র নফসগুলো আল্লাহ্‌র নূরে নূরময় হতে পেরেছেন তাঁদের দেহগুলো যে স্থানে রাখা হয়, সেই স্থানগুলোকে 'মাজার' অথবা 'রওজা' বলা হয়। মাজার পবিত্র স্থান। কারণ এইটি কবর নয়, কবর এবং মাজারের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে। ধর্মীয় পরিভাষায় মৃত মানুষের জন্য কবর। জীবিতের জন্য নয়। অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ থেকে যিনি ফানা তথা নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন ইসলাম তাঁকে সর্বসময় জীবিত বলে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যিনি সর্বসময় জীবিত তাঁর আস্তানাকে কবর না বলে মাজার বলা হয়।

ইসলামে কবর পূজা নিষেধ। কারণ কবরে মৃত ব্যক্তি থাকেন। মাজারে জীবিত ব্যক্তি থাকেন। মাজার আল্লাহ্‌র পাগলদের ঘর। এখানে বিচিত্র ধরণের আল্লাহ্‌র আসেক আসবে এবং বিচিত্রভাবে তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করবে, এখানে গোলাপই একমাত্র ফুল, তাই অন্য ফুলের স্থান নেই, গন্ধ নেই, বলার মতো বোকামি থাকতে পারে না। বিচিত্র ধরণের ফুল এবং একেক ফুলের একেক রকম রূপ ও সুগন্ধির বৈচিত্র্যতার বিকাশের নাম ফুলের বাগান। এই বহু ফুলের বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন গন্ধ একেরই আদর্শ প্রচার করে।

'নূরে হক জাহের বুয়াদ আন্দর অলি / নেক্‌বী বাঁশী আগার আহ্‌লে দীলি।' অর্থাৎ- *অলির মাজারে আল্লাহ্‌র নূর বিকশিত সদা রয়, / সেই নূরে আলো পাইবে দেখিতে, থাকে যদি সেই হৃদয়*। -জালালুদ্দিন রুমী (মসনবী শরীফ)

রওযা মোবারক, মাজার শরীফ, ও কবর জিয়ারত করা সুন্নাত ও কুরবাত (নৈকট্য

লাভ) অনুরূপভাবে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা ও সুন্নাত। কুরআন ও সুন্নাহ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বলেন, ইসলামের প্রথমদিকে মুসলমানের পৃথক কবরস্থানের অভাবে এবং ওহীপ্রাপ্তির পূর্বে জিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। ওহীপ্রাপ্তি ও পৃথক কবরস্থানের ব্যবস্থার পর জিয়ারত করার পূর্ব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নবী করিম (সাঃ) জিয়ারত করার অনুমোদন ও নির্দেশ প্রদান করেন এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করেন, কাজেই মাজার ও কবর জিয়ারত নবীজির সুন্নাত। 'নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন : আমি প্রথমদিকে তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো' (মুসলীম শরীফের)।

বায়হাকী শরীফে আছে-নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেন: আমি তোমাদেরকে প্রথম দিকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা জিয়ারত করো। কেননা কবর জিয়ারত কল্বকে নরম করে। চোখে অশ্রু ঝরায় এবং পরকালকে স্মরণ করায়। হযরত মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন- নবী করিম (সাঃ) শেষরাত্রে মদিনা শরীফের বাকীউল গারকাদ (জান্নাতুল বাকী) নামক কবরস্থানে গমন করে জিয়ারত করতেন। তিনি ইন্তেকালপ্রাপ্ত সাহাবিগণকে এভাবে সালাম দিতেন এবং দোয়া করতেন : 'হে পরকালের মুমিন বাসিন্দাগণ, তোমাদের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা তোমরা আগামীতে পেয়ে যাবে। তোমরা আমাদের আগে গমন করেছো। আমরাও ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ্ তুমি জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের বাসিন্দাদের ক্ষমা করে দাও (মুসলীম শরীফ)। নবী করিম (সাঃ) কবরস্থানে নিজে জিয়ারত করেছেন। কাজেই কবর জিয়ারত করা হুজুর (সাঃ) এর কর্মের দ্বারা সুন্নাত প্রমাণিত। কাজেই নিকটে বা দূরের যে কোন কবর বা মাজারের জিয়ারতের জন্য সফর করাও সুন্নাত। বিদ্আত বললে গুনাহ হবে।

কবর (মাজার) জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার দলিলসমূহ- নবী রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার ফযিলত মেশকাত শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয় বরং একমাত্র আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই সরাসরি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে যাবে' (তাবরানী ও দাবেকুতনী)। উক্ত হাদীসে পরিস্কার করে বলা হয়েছে শুধু হুজুরের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার জন্য। তা যদি বিদআত হতো তাহলে কি তিনি সরাসরি সফর করতে বলতেন? ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থের মোকদ্দমায় ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মাহাত্ম বর্নণা প্রসঙ্গে আল্লামা শামী (রঃ) লিখেছেন 'ইমাম শাফেয়া (রঃ) সুদূর ফিলিস্তিন থেকে সফর করে বাগদাদ শরীফ আসতেন এবং ইমাম আবু

হানিফার মাজার জিয়ারত করে বরকত হাসিল করতেন। এতে তাঁর মকসুদ সাথে সাথে পূর্ণ হয়ে যেতো। কারো কোন মনোবাসনা থাকলে সে যেন আমার কবরের পাশে এসে মনোবাসনা পূরণের জন্য ফরিয়াদ জানায়। আমি ঐ মনোবাসনা পূর্ণ করিয়ে দেবো (লাওয়াকিহুল আনওয়ার)।

আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) আর একটি হাদীস থেকে জানা যায়- তোমরা আমায় রহম-দিল উম্মতের (অলির) নিকট তোমাদের মকসুদের জন্য সাহায্য চাও। তাহলে তোমরা রিজিকপ্রাপ্ত হবে এবং মকসুদও পূর্ণ হবে। 'আল বাছায়ের' ও 'গাউছুল ইবাদ' গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে- 'হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আনহা মদিনা শরীফ থেকে সফর করে মক্কা শরীফে এসে তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) এর মাজার জিয়ারত করতেন'। যদি কবর বা মাজার জিয়ারত উদ্দেশ্যে সফর করা বিদ্আত হতো হযরত আয়েশা (রাঃ) আনহা কখনও সে কাজ করতেন না। আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান, তার রহমতও সব জায়গায় রয়েছে। দাতা হচ্ছেন আল্লাহ্ যিনি সর্বত্র মওজুদ। তা সত্বেও কোন জিনিসটা তালাশ করার জন্য আউলিয়া কিরামের মাজারে সফর করে যাওয়া হয়? উত্তরে আউলিয়া কিরামগণ হলেন আল্লাহ্র রহমতের দরজা। এ দরজাসমূহ দিয়েই রহমত প্রবাহিত হয়। রেলগাড়ি তার সারা লাইন দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু একে ধরতে হলে স্টেশনে যেতে হয়। যদি অন্যত্র লাইনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকেন, রেল নিশ্চই আপনার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে সত্য, কিন্তু আপনি ধরতে পারবেন না। ডাক্তারের কাছে রোগী কেন সফর করে আসে? আল্লাহ্ই তো আরোগ্যদানকারী এবং তিনিতো সর্বত্র আছেন। আবহাওয়া পরিবর্তন করার জন্য দার্জিলিং ও কাশ্মির ভ্রমণ করা হয় কেন? ওখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর। আর আউলিয়া কিরামের স্থানসমূহের আবহাওয়া ঈমানের জন্য কল্যাণকর।

আল্লাহ্তাআলা হযরত মূসা (আঃ) কে হযরত খিজির (আঃ) এর কাছে কেন পাঠিয়েছিলেন? ওগুলো সব কিছুতো এখান থেকেই দিতে পারতেন। কুরআনে আছে হযরত জাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। বোঝা গেল যে হযরত জাকারিয়া (আঃ) হযরত মরিয়ম কাছে দাঁড়িয়ে সন্তানের জন্য দোয়া করেছেন অর্থাৎ অলির কাছে গিয়ে দোয়া করা মানে দোয়া কবুল হওয়া। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আউলিয়া কেরামের মাজার সমূহের কাছে দোয়া কবুল হয়। মহিলাদের কবর বা মাজার জিয়ারতের ব্যপারে শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ঈমামগণের মতে পুরুষ লোকদের জন্য কবর জিয়ারত করা বিনা শর্তে সুন্নাত এবং মেয়ে লোকদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ ও সুন্নাত। আম্বিয়ায়ে কেরামের রওযা মোবারকসমূহ এবং বজুর্গানে দ্বীনের মাজারসমূহ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে জিয়ারত করা নারী-পুরুষ সবার জন্যই সুন্নাত। তবে কিছু শর্ত আছে। যেমন- পর্দা সহকারে গমন করা, পুরুষদের সাথে মিলে মিশে জিয়ারত না করা, চিৎকার করে বুকফাটা আর্তনাদ না করা ইত্যাদি।

কেননা নবী করিম (সাঃ) যেই হাদীসে কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন সেখানে নারী-পুরুষ সকলেকেই অনুমতি দিয়েছেন। মেয়েলোকদের নীরব কান্নাকাটি করার ব্যাপারটি নিষিদ্ধ নয়। তবে ধৈর্য ধারণ করার তাকিদ রয়েছে। বোখারী ও মুসলীম শরীফের হাদীস দ্বয়ে উল্লেখ আছে, নবী করিম (সাঃ) জৈনিক মহিলা সাহাবিয়াকে কোন এক কবরস্থানে তাঁর ছেলের কবরের পাশে কান্নারত অবস্থায় দেখে তাকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেন। কিন্তু জিয়ারত করতে নিষেধ করেননি। বুঝা গেল ধৈর্য ধারণের শর্তে মহিলাদের জিয়ারতের অনুমতি রয়েছে। মহিলাকুল শিরোমণি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রাঃ) আনহা প্রতি জুমার দিনে মদিনা শরীফ হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আমির হামজা (রাঃ) আনহুর মাজার শরীফ জিয়ারত করার জন্য গমন করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) আনহা মদিনা শরীফ হতে ৫০০ কিঃ মিঃ দূরে মক্কায় অবস্থিত আপন ভাই আবদুর রাহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) মাজার জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করতেন। ইমাম দ্বিতীয় হাসান (রাঃ) ইন্তেকাল করলে তাঁর বিবি তাঁর মাজার পাকা করে তথায় এক বছর বসবাস করেছেন। নবীবংশের নারীগণের আমল অন্যান্য নারীদের জন্য আদর্শ। অলির মাজারে চুমু দেয়া বা বুজুর্গগণের কদম চুম্বন করা সাহাবাগণের আমল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- হযরত ফাতেমা (রাঃ) আনহা হুজুর (সাঃ) এর রওজা মোবারকে চিবুক বা গাল স্থাপন করতেন বলে নির্ভরযোগ্য রেওয়াতে পাওয়া যায়। হযরত বেলাল (রাঃ) সিরিয়া হতে এসে রাসূলে পাক (সাঃ) এর রওজা মোবারকে মাথা ঘর্ষণ করেছিলেন বলে সহী সনদে পাওয়া যায় (শিফাউস সিকাম ও আদিল্লাতু আহলুছ ছুন্নাত)।

তদুপরি, নবম হিজরীতে আবদুল কায়েছ প্রতিনিধিদল মদিনায় হুজুর (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে হুজুরের পবিত্র হাত ও কদম মোবারকে চুম্বন করেছিলেন বলে মিশকাত শরীফে উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা সাহাবিগণের সুন্নাত যারা উপুর হয়ে কদমবুছিকে না-জায়েজ অথবা শিরকের সাথে তুলনা করে তারা অজ্ঞ ও মুর্খ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে তাঁর কাছে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল হুজুর (সাঃ) এর মিম্বর বা পবিত্র কবর মুবারকে চুম্বন দেয়াটা কেমন? তিনি এর উত্তরে বলেছিলেন, কোন ক্ষতি নেই। মক্কা শরীফের শাফেঈ উলামায়ে কিরামের অন্যতম হযরত ইবনে আবিস সিন্‌ফ ইয়ামানী থেকে বর্ণিত আছে- কুরআন করীম ও হাদীস শরীফের পাতাসমূহ এবং বুজুর্গানে দ্বীনের কবরসমূহ চুম্বন দেয়া জায়েয। প্রখ্যাত 'তুশেখ' গ্রন্থে আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (কুঃ) বলেছেন হযরত আসওয়াদের চুম্বন থেকে কতেক আরেফীন বুজুর্গানে কিরামের মাজারে চুমু দেয়ার বৈধতা প্রমাণ করেছেন। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা স্বীকৃত যে অলির মাজারে যাওয়া ও মাজারে গিয়ে কিছু চাওয়া সম্পূর্ণ রূপে জায়েজ।

ওরশ কাকে বলে?
ওরশ করা জায়েজ কিনা?
ওরশে গরু-ছাগল কাটা জায়েজ কি না?
এবং ঐ মাংস দিয়ে যে নেওয়াজ তৈরি করা হয়, তা খাওয়া জায়েজ কি না?

ওরশের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'শাদী' বা 'বিবাহ'। আউলিয়া কেরামের ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষে সওয়াব রেসানীর অনুষ্ঠানকে সুফিগণ ওরশ নামে আখ্যায়িত করেছেন। এটি সুফিদের খাস ভাষা। আরবী ভাষায় একই শব্দের বহু অর্থ থাকে যাকে 'লফজে মুশতারিক' বলে। ওরশকে আরবীতে মা'না বলা হয়। ভাষাবিদগণ এ শব্দটিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। যেমন- হাকিকী ও মাজাজী ইত্যাদি। হাকিকীগতভাবে 'ওরশ' শব্দের অর্থ খুশি, ওয়ালিমা বা বিবাহোত্তর দাওয়াত, বর-বধূর মিলন বা বাসর ইত্যাদি এবং মাজাজীগতভাবে এর দ্বারা কোন বরেণ্য সুফী সাধকের ইন্তেকাল বার্ষিকীতে তাঁর রুহপাকে সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে দোয়া-দরুদ পাঠ, জেকের-ফেকের, ওয়াজ-নসীহত যাবতীয় আধ্যাত্মিক কার্যক্রমভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠানকে বোঝায়।

মিশকাত শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, মুনকার-নকির মইয়তের পরীক্ষা নেয়। এবং যখন সে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, তখন তাঁকে বলেন- আপনি সেই কনের মত শুয়ে পড়ুন, যাঁকে তাঁর প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ উঠাতে পারে না। তাই মুনকার-নকির ফিরিশতাদ্বয় যেহেতু ওই দিনকে ওরশ বলেছেন, সেহেতু ওরশ বলা হয়। উক্ত হাদীসে 'ওরশ' শব্দটিকে মিসদাক হিসেবে মানকূলে শরয়ী বলে গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীসে উল্লেখিত 'নম্ কানাওয়াতিল উরসিল্লাজি লা ইয়ুকিযুহু ইল্লা আহাব্বু আহ লিহি ইলাইহি'- থেকে গৃহিত 'ওরশ' শব্দের গুরুত্ব ও তাৎপর্য মেনেই সুফীগণ আল্লাহ্‌র অলিদের ইন্তেকালের দিবসকে 'ইয়াওমূল ওরশ' বা 'ওরশ শরীফ' নামকরণ করেছেন।

ইন্তেকালের পর আল্লাহ্‌র অলির সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত ঘটে, এই জন্য এই দিনকে ওরশ বলা হয়। ওরশের উৎস হাদীসে পাক ও ফকিহগণের উক্তি থেকে প্রমাণিত। 'আন্তা মা আ'মান আহবাবতা।' অর্থাৎ- তুমি যাকে ভালোবাস, আখেরাতে তুমি তারই সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ্‌র অলির নামে যখন আমরা ওরশ করি তখন অলি সওয়াব নজর পেয়ে খুবই খুশি হন এবং দোয়া করতে থাকেন। এই আত্মিক খুশি বা সন্তুষ্টির কারণে এই সওয়াব রেসানীর অনুষ্ঠানের নাম 'ওরশ' রেখেছেন।

তরিকার আউলিয়া কেরাম, মুস্তাহ্‌সান বা পূণ্যজনক মনে করে ওরশ শরীফের অনুষ্ঠান করে আসছেন। মুজাদ্দেস অলিফেসানী (রঃ) স্বীয় মুর্শিদ হযরত বাকী বিল্লাহ (রঃ) এর ওরশ শরীফে যোগদান করার জন্য দিল্লিতে অবস্থিত তাঁর মাজার শরীফে হাজির হতেন। হযরত গাউছুল আযম মহীউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) প্রতি বছর ফাতেহায়ে দোয়াজ দাহম উদযাপন করতেন, যা দয়াল নবীর (সাঃ) ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষে মহান ফাতেহাখানীর অনুষ্ঠান ছিল। চিশ্‌তীয়া তরিকার সকল পীরানে পীরগণ আনুষ্ঠানিকভাবে ওরশ শরীফের মাহফিল করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ) স্বীয় মুর্শিদ হযরত ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রঃ) এর ওরশ শরীফ নিয়মিত প্রতি বৎসর উদযাপন করতেন। আউলিয়ায়ে কেরামের ইন্তেকাল বার্ষিকীতে ওরশ শরীফ উদযাপনের প্রথা পবিত্র মক্কা ও মদীনার পাক জমিনেই শুরু হয়েছিল এবং তারই অনুসরণে পরবর্তীতে বিভিন্ন মুসলিম দেশে এর ব্যাপক প্রচলন ঘটে।

বিশেষ করে মদীনাবাসীগণ হযরত আমীর হামজা (রাঃ) এর ওরশ নিয়মিত উদযাপণ করতেন। আরব দেশে ওরশ উদযাপনের এরকম অসংখ্য উদাহরণ ইতিহাসে উল্লেখ আছে। প্রকৃত সত্য এটাই যে, সুন্নী শাসনামলে আরব দেশে ওরশ শরীফ নিয়মিত উদ্‌যাপিত হত, কিন্তু পরবর্তীকালে ওহাবী ধারায় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে পাশবিক শক্তি বলে ওরশ শরীফ বন্ধ করে দেয়া হয়।

ওরশ শরীফ বৈধ এবং জায়েজ। ওরশ শরীফ শরীয়তভিত্তিক একটি মুস্তাহসান অনুষ্ঠান। ওরশ শরীফের পক্ষে পবিত্র হাদিস ও বিভিন্ন ফাতওয়ার কিতাবে অনেক দলিল প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ইবনে আবি শাইবা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর আলাইহিস-সালাম প্রতি বছর উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং ওদেরকে সালাম দিতেন। চার খলিফাগণও অনুরূপ করতেন। আধ্যাত্মিক কার্যক্রমভিত্তিক ওরশকে আমরা বৈধ ও মুস্তাহসান মনে করি। এরকম শরীয়তসম্মত আধ্যাত্মিক কার্যক্রমসমূহের মধ্যে পবিত্রতার মহাউপাদান বিদ্যমান আছে। কাজেই পবিত্র অনুষ্ঠান হিসেবে তা অবশ্যই অর্জিতব্য বিষয়। এ বিষয়টি জানা আছে বলেই ওরশ শরীফ আহলে তাসাউফ সম্প্রদায়ের খাস অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ওরশের নেওয়াজ খাওয়া সম্পূর্ণ রূপে জায়েজ। অলির নামে মানতের মাধ্যমে অলির দরবারে হাদিয়া পেশ করেন এবং এর সওয়াব অলির রুহে পাকে বখশিস করে রুহানী দোয়া চান- এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই সব কিছু আল্লাহ্‌র নামেই করা হয়। নবী ও অলির নামের এরূপ মানত বা হাদিয়া হিসাবে গণ্য হয় এবং এর সাওয়াব তাঁদের রুহে পাকে পৌছানো হয়। জীবিতদের পক্ষ থেকে অলির আত্মার জন্য এরূপ হাদিয়া পেশ করা শরীয়তে বৈধ। মুসলিম শরীফ হাদিস- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন- জনৈক সাহাবী নবী করিম (সাঃ) এর খেদমতে আরজ করলেন, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু কোন অসিয়ত করে যান নি। আমি তাঁর জন্য কিছু সদকা করলে তিনি তাতে উপকৃত হবেন কি? হুজুর (সাঃ) বললেন- হ্যাঁ (মুসলিম শরীফ) ।

ওরশে পশুজবাই করে জবেহকারীর নিয়ত যদি জবাই করার সময় এবং ছুরি চালাবার সময় আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কারো জন্যে হয়, তবে শিরক হবে। কিন্তু জবেহ্ করার পূর্বে বা পরে কারো নাম নিলে বা উদ্দেশ্যে করলে শিরক হবে না। সুতরাং জবেহ্‌কারী যদি ছুরি চালানোর সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে জবেহ্ করে অথবা আল্লাহ্‌র নামের পরিবর্তে অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে তাহলে ঐ পশু মৃত বলে গণ্য হবে এবং জবেহ্‌কারী মুশরিক হবে। আর জবেহ্ করার সময় বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর বলে জবেহ্ করা হলে তা হালাল হবে, যদিও পূর্বে কারো নামে পশু নির্ধারণ করা হোক না কেন, কোন মুসলমানই জবাই করার সময় অল্লাহ্‌র নাম ছাড়া কারো নাম উচ্চারণ করে না। জবাই করার পূর্বে বা পরে কোন বুজুর্গ ব্যক্তির বা অলির নাম নিয়ে তাঁর রুহে এর সওয়াব পৌঁছে দেয়া দোষণীয় নয়। যেমন কোরবানীর সময় প্রত্যেক মালিকের নাম নেয়া হয় এবং জবাই করার সময় আল্লাহু আকবর বলে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়। এই জন্য জবাই করা পশুর মাংস খাওয়া ও তা দিয়ে ওরশের নেওয়াজ তৈরি করা ও তা সবাই মিলে তাবারক হিসেবে খাওয়া জায়েজ ও বৈধ। অলির রুহে ইসালে সাওয়াবের নিয়তে পশু জবাই করাও সুন্নাত। একটি হাদীস হযরত জাবের (রাঃ) থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেন- মেহমানের জিয়াফতের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি পশু-পাখি জবাই করবে রোজ হাসরে ঐ পশু-পাখি তার জন্যে দোজখ থেকে মুক্তির উপলক্ষ্য হয়ে যাবে। এই থেকে বুঝা যায় ওরসের গরু-ছাগল কাটা এবং তার মাংস দিয়ে নেওয়াজ বানানো এবং সবাইকে খাওয়ানো শরীয়তসম্মত ও জায়েজ।

যারা এই বৈধ এবং হালাল খাবারকে হারাম বলে, তারা অবশ্যই গুনাহগার এবং অলি আউলিয়াদের দুশমন। তাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে ওরশ করা ও গরু-ছাগল কেটে নেওয়াজ করা এবং তা খাওয়া সম্পূর্ণ রূপে হালাল ও জায়েজ।

জিকির কাকে বলে?
উচ্চস্বরে জিকির পড়া যায় কিনা?
দুরূদ শরীফ পড়া জায়েজ কি না?

জিকির শব্দটির অর্থ হলো যোগাযোগ অথবা সংযোগ। অতি সম্ভ্রান্ত এবং অতি উচ্চ মার্গের ভাষাটি হলো 'স্মরণ'। কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন, 'অজকুরিছমা রাব্বিকা বুকরাতাউ অ আছীলা', অর্থাৎ- সকাল-বিকাল তোমার রবের জিকির কর (সূরা-দাহর, আয়াত-২৫)। আল্লাহ্ বলেছেন, আল্লাহ্র জিকির এমনভাবে কর যেমনভাবে তোমাদের বাপ-দাদারা জিকির করত বরং তদপেক্ষা বেশি। এ জন্যে উচ্চস্বরে তালবিয়া অর্থাৎ লাব্বাইক পাঠ করা সুন্নাত। বিশেষ করে বিভিন্ন কাফেলা একত্রিত হবার সময় আল্লাহ্তায়ালা আরও ইরশাদ করেছেন, 'যখন কুরআন শরীফ পাঠ করা হবে তখন মনোযোগ সহকারে শোন এবং নিশ্চুপ থাক'। বোঝা গেলো যে, উচ্চস্বরে কোরআন তিলাওয়াত জায়েজ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। ফরজ নামাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পর উচ্চস্বরে জিকির করা হুজুর (সাঃ) এর যুগে প্রচলিত ছিলো। উচ্চস্বরের জিকির শুনে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বুঝতেন যে, জামাত শেষ হয়েছে (বোখারী শরীফ)।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ ফরমান, 'যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি, আর যে ব্যক্তি সমাবেশে আমার জিকির করে, আমিও তাকে এর থেকে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। এর থেকে বোঝা যায় যে, জানাযা নিয়ে যাবার সময় কলেমা তৈয়্যবা বা অন্য কোন জিকির উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে সব রকমের জায়েজ আছে। তাফসীর রুহুল বয়ানে চতুর্থ পারায় আয়াতের ব্যাখ্যা উচ্চস্বরে জিকির করা জায়েজ বরং মুস্তাহাব। যদি কপটতা না থাকে এবং দ্বীনের প্রচারই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। জিকিরের বরকত ঘরে অবস্থানরত শ্রোতাদের কাছেও পৌঁছাবে এবং যিনি আওয়াজ শুনে জিকিরে মশগুল হবেন (তিনিও বরকতের ভাগী হবেন) এবং কেয়ামতের দিন আর্দ্র-শুষ্ক সব কিছু

জিকিরকারীর ঈমানের সাক্ষ্য দিবে।

'মাছালুললাযী ইয়াযকুরুল্লাহা রাব্বাহু ওয়াল্লাযী লা ইয়াযকুরু কামিছলিল হাইয়্যে ওয়াল মাইয়্যেত', অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র জিকির করে ও যারা জিকির করে না তারা যেন জীবিত ও মৃত লোক তুল্য।

ইমাম গাজ্জালির পীর আবু আলি ফারমাদি, ইমাম গাজ্জালিকে বলেছিলেন, এই বলে যে, তুমি কালি কলম দিয়ে ঘষে ঘষে অনেক কাগজ নষ্ট করেছ, আর আমি আমার কলবের উপর আল্লাহ্‌র জিকির দিয়ে একটানা বছরের পর বছর ঘষেছি। এইভাবে ঘষতে ঘষতে আমি আল্লাহ্‌কে পেয়েছি।

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, 'কোন কওম বা দল আল্লাহ্‌র জিকিরের মাহফিলে বসে সম্মলিতভাবে জিকির করলে আল্লাহ্‌র ফেরেস্তাগণ তাঁদেরকে বেষ্টন করে রাখে, আল্লাহ্‌র রহমত তাঁদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে। আর তাঁদের কথা আল্লাহ্‌তায়ালা আপন ফেরেস্তাদের নিকট গর্বের সাথে আলোচনা করেন। সম্মিলিত জিকির করার অর্থই জোরে জিকির করা (মুসলিম শরীফ)।

বায়হাকী শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, তোমরা অধিক হারে এমনভাবে জিকির করো যাতে তোমাদেরকে পাগল বলা হয়। যে পর্যন্ত তোমাদেরকে পাগল না বলা হবে, সেই পর্যন্ত তোমরা 'মোমেন' হবে না। মোমেন না হলে আল্লাহ্‌তায়ালা দোয়া কবুল করেন না। সম্মিলিত জিকির ও জোরে জিকির না হলে কিভাবে পাগল বলা হবে। অতএব উচ্চস্বরে জিকির করা সুন্নাত।

একরাত্রে রাসূল (সাঃ) আবু বকর (রাঃ) বাড়িতে গিয়ে শুনলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) চুপে চুপে জিকির করছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, লোক দেখানের ভয়ে এই রূপ করিয়াছি। হুজুর (সাঃ) বললেন বেশ ভাল করেছ। আবার হযরত ওমর (রাঃ) এর বাড়িতে যেয়ে দেখলেন তিনি জোরে জোরে জিকির করছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন শয়তান বিতারণের উদ্দেশ্যে জোরে জিকির করছি। হুজুর (সাঃ) বললেন, খুব ভালো কাজ করছ। আবার হযরত বিল্লাল (রাঃ) এর ঘরে গিয়ে দেখলেন তিনিও জোরে জোরে জিকির করছেন, কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, গাফেল লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে জোরে জিকির করছি। হুজুর (সাঃ) বললেন, বেশ ভালো করেছো (হাদিকাতুল নাদিয়া, খালেদ বাগদাদীর)।

এ থেকে বোঝা গেলো যে, হুজুর (সাঃ) জিকরে জলি ও জিকরে খফি উভয় জিকির অনুমোদন করেছেন। যিনি রিয়ার ভয় করেন, তাঁর জন্য 'খফি' জিকির উত্তম আর যিনি শয়তানকে বিতারণ ও বেখবর দিলকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে জলি জিকির করেন, তাঁর জন্য 'জলি' জিকিরই উত্তম। এজন্যই তরিকতপন্থী পীরগণ মুরিদের অবস্থাভেদে জলি অথবা খফি জিকিরের তালিম দিয়ে থাকেন।

কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা উচ্চস্বরে জিকির পড়া জায়েজ।

দুরূদ শরীফ সমন্ধে আল্লাহ্তায়ালা নিজেই বলেন, 'ইন্নাল্লা-হা অমালা-ইকাতাহু ইউছাল্লুনা আ লান্নাবিইয়্য, ইয়া আয়্যুহাল্লাজীনা আমানু ছাল্লু আলাইহি আছাল্লিমু তাছলিমা।' অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাহার ফেরেশতামণ্ডলী নবীর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করেন। অতএব হে মুসলমানগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করো ও ছালাতুছ ছালাম প্রদান কর (সূরা-আহযাব, আয়াত-১১০)। সুপ্রসিদ্ধ 'দালায়েলুল খায়রাত' নামক গ্রন্থের ভুমিকায় উল্লেখিত আছে হুজুর (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- আপনার থেকে দূরে অবস্থানকারী ও পরবর্তীকালে ধরাধামে আগমনকারীদের দুরূদ পাঠে আপনার দৃষ্টি কি রকম হবে? ইরশাদ করেন, আন্তরিক, অকৃত্রিম ভালোবাসা ও মহাব্বত সহকারে দুরূদ পাঠ যারা করবে তাদের দুরূদ আমি নিজেই শুনি এবং তাদেরকেও চিনি। আর যাদের অন্তরে আমার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা নেই, তাদের দুরূদ আমার কাছে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে পেশ করা হবে।

মাওলানা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রঃ) রচিত 'আনিসুল জলীস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে হুজুর (সাঃ) বলেন- প্রতি সোমবার ও শুক্রবার আমার ওফাতের পর বেশি করে দুরূদ পাঠ করবে। তোমাদের দুরূদ আমি সরাসরি শুনি। কোরআন ও হাদীস দ্বারা দুরূদ শরীফ পড়া জায়েজ ও আল্লাহ্র সুন্নাত। তাই প্রতিটি মানুষের বেশি বেশি করে দুরূদ পড়া কর্তব্য।

কাদেরিয়া ভাণ্ডারের নিয়মিত অনুষ্ঠানমালা

কাদেরিয়া ভাণ্ডারে তরিকতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যথাযথ মর্যাদায় নিয়মিত পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিদিনই এই শাহী দরবারে বাদ মাগরিব জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানই গদ্দিনশীর পীরজাদা হযরত শামীম শাহ্‌র (মা.আ.) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

* সপ্তাহের প্রতি সোমবার বাদ মাগরিব মুর্শীদ কেবলা বাবা সিরাজ শাহ্‌র ওফাত দিবসে ফাতেহা শরীফ, জিকির আসকার ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

* সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শরীফ খতম, বাদ মাগরিব পবিত্র মিলাদ মাহফিল, ফাতেহা শরীফ ও জিকির মাহফিল।

* প্রতি চান্দ্র মাসের ১০ তারিখ দিবাগত রাতে পবিত্র এগার শরীফ।

* প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার পবিত্র 'দরূদ শরীফ' ও পাক কালাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' খতম, জিকির, পবিত্র মিলাদ মাহফিল এবং মোনাজাত। এইদিন ভোরে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে থাকে। পবিত্র এই অনুষ্ঠানটি কাদেরিয়া ভান্ডারের এক বরকতময় অনুষ্ঠান।

* প্রতিবছর ৪,৫ ফেব্রুয়ারি পবিত্র বার্ষিক ওরস শরীফ উদ্‌যাপন।

* পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন।

* পয়লা রমজান গওসুল আজমের পবিত্র জন্মদিন উদ্‌যাপন।

* প্রতিবছর ৬ রজব সুলতানুল হিন্দ গরিবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর (র.) পবিত্র ওরস মোবারক উদ্‌যাপন।

* পবিত্র ফাতেহা ইয়াজ দাহম উদ্‌যাপন।

* পবিত্র আশুরা উদ্‌যাপন।

* প্রতি বছর ১০ই আশ্বিন মুর্শিদ কেবলা এ যুগের শ্রেষ্ঠ অলি শাহেনশাহ্‌-এ তরিকত, সুলতানুল আউলিয়া, আলহাজ্ব শায়খ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশতীর (ম.আ.) শুভ জন্মদিনকে ভক্ত-মুরিদ ও আশেকীনগণ 'খোশরোজ' হিসাবে যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সংগে পালন করে থাকেন।

* প্রতিবছর ২৯শে এপ্রিল, ১৬ বৈশাখ সাজ্জাদানশীন পীরজাদা আলহাজ্ব সাইয়্যেদ খাজা শাহ্ মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম কাদ্‌রী আল্ ওয়াল চিশতীর (কু.) শুভ জন্মদিন ভক্ত-মুরীদান আশেকানরা দরবার শরীফে অত্যন্ত তরিকত, মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সংগে উদ্‌যাপন করে থাকেন।

এছাড়া বছরব্যপীই তরিকতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ নিয়মিত জিকির-আসকার, মিলাদ মাহফিল, তসবিহ-তাহলিল পাঠ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, তফসিরে কোরআন, দরসে কোরআন, পবিত্র হাদীস চর্চা, ইল্‌মে শরিয়ত, মারেফাত এবং তরিকতের তালিম ও তালকিন চলে দিনভর।

কর্তব্য ও নির্দেশনা

১. সকল বিষয়ে নবী (সাঃ) এর সুন্নত অনুসরণ করতে হবে। যে নবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে যাবে সে কখনও মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছতে পারবে না। নবী করিম (সাঃ) এর ভালোবাসা ও ধর্মমত অনুযায়ী না চলে কেউ যদি তার বিপরীত মত অনুযায়ী চলে, সে কখনো খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভে সমর্থ হবে না।

২. আল্লাহ্‌কে দিবা-রাত্রি দমে দমে স্মরণ করো। তবেই তুমি কল্যাণ ও শান্তি প্রাপ্ত হবে। 'মরার আগে মর', তবেই অনন্তকাল চির অমর থাকবে ।

৩. আল্লাহ্‌তালাকে মহব্বত ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে আল্লাহ্‌তালা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। শরীয়তের যাবতীয় হুকুম মেনে চল; তাহলে তরিকতের সকল কাজ সহজ হয়ে যাবে।

৪. কখনো পরনিন্দা ও গীবত করো না। কারণ গীবত জেনার চইতেও নিকৃষ্ট গোনাহ। কারো নিন্দা করা, কারো অনিষ্ট করা এবং কাউকে অভিশাপ দেয়া আল্লাহ্‌ওয়ালাদের নিষেধ।

৫. সদা সত্য কথা বলা, অল্প আহার করা এবং হালাল ও পবিত্র খাদ্য খাওয়া, অল্প নিদ্রা ও অল্প কথা বলা তরিকতের মূলমন্ত্র।

৬. পীর একজন দ্রষ্টা। কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। হেদায়েত প্রাপ্তদের সঙ্গী হয়ে ইবাদত না করলে কোন ইবাদতই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। নিজের অন্তরকে তাজা ও পাক-পবিত্র কর। অন্তর পাক হলে কোন পাপ কর্মই তোমাকে স্পর্শ করবে না।

৭. আল্লাহ্‌ওয়ালাকে গাছ চেনে, মাছ চেনে, পশু-পাখি, জ্বীন-পরী সবাই চেনে- কিন্তু মানুষের ভিতরে একটা জাত আছে তারাই আল্লাহ্‌ওয়ালাকে চেনে না।

৮. তুমি তোমার আমিত্ব বা স্বকীয়তা বর্জনের চেষ্টা করতে থাক। আর এটাই তোমার রবের তসবীহ। এইটি পাঠ নয়, মৌখিক কীর্তন নয়- এইটি প্রধানত আমল।

০৯. এমন লোক/পীর ভাই আছে যাকে একবেলা খাওয়ালে লাখ-লাখ লোককে খাওয়ানোর চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে।

১০. ওরশ শরীফে কোন শোরগোল ও বেয়াদবি করো না। কারণ এটা অলি আল্লাহ্‌দের মজলিস। যদি কেউ বেয়াদবি করে তবে দু'একদিন-আগে পরে তার তকদিরে পোঁকা ধরবে। এমন কি অশান্তি করলে ফায়েজ বন্ধ থাকবে। আর বিপদ নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

১১. নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকদের মা-খালা ও বোনের দৃষ্টিতে দেখা না হলে মন আর নফসকে সংবরণ করা কঠিন হয়ে যাবে। তুমি হালকা হয়ে যাবে। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারবে না।

১২. যে যা কিছু অর্জন করে তদনুসারেই সে তার বন্ধু পেয়ে থাকে। তাই জালেমের বন্ধু জালেমই হয়ে থাকে। আর সৎ লোকের বন্ধু সৎই হয়ে থাকে।
১৩. তুমি মুরিদের স্তরে থাকা পর্যন্ত তোমার অদৃষ্টে যা কিছু আছে তা শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রহণ কর। যখন তুমি খাছ ছিদ্দীকগণের (আল্লাহ্ ওয়ালা) স্তরে উন্নীত হবে, তখন এলহাম অনুসারে গ্রহণ করো।
১৪. পীরের রঙে রঙিন হও তবেই মুক্তি ও শান্তি, পীরের রঙে রঙিন হলে হাজারো সাহায্যকারী এসে তোমাকে সাহায্য করবে।
১৫. মানুষের প্রতিটি কাজেরই একটি পুঁজি থাকে। ফকিরির পুঁজি হল সেই চেষ্টা ও পরিশ্রম যা খাঁটি দিলে আল্লাহ্তালার জন্য করা হয়।

দয়াল বাবা সিরাজ শাহ্ ও
তরিকত নিয়ে সাধারণ বিতর্ক

প্রকাশকাল
৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রকাশ
কাদরিয়া ভাণ্ডার, সিরাজ শাহ্‌র আস্তানা
পুরান বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

Web : www.sirajshah.org

মুদ্রণ
অপরাজিতা গ্রাফিক্স এন্ড পাবলিকেশন্স
১৪৫ জাকির সুপার মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ

হযরত খাজা শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদ্‌রী ওয়াল চিশ্‌তী (রঃ) এর
রওজা মোবারক

পীরে কামেল, পেশওয়া তরিকায়ে কাদরিয়া ওয়াল চিশতিয়া
আলহাজ্ব সৈয়দ খাজা শাহ্ মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম আল কাদরী শামীম শাহ্
কাদরিয়া ভাণ্ডার সিরাজ শাহ্র আস্তানার কর্ণধার। তাঁর হাতে হাত রেখেই এখন
অগণিত পথহারা মানুষ বায়াত প্রাপ্ত হচ্ছেন; ইলমে শরিয়ত, তরিকত, মারেফাত
ও হকিকতের মহান শিক্ষায় আলোকিত হচ্ছেন।